182. Cc. 911. 1.
182 Ce. 911. 1.

শ্রীমৎ-শ্যামানন্দ-চরিত।

"কিবা বিপ্র, কিবা শূদ্র, ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীমধুসূদনদাস অধিকারি-প্রণীত।

জেলা হুগলী—পোঃ আলাটী,
"শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী কার্য্যালয়" হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

মূল্য বাঁধাই—১৷৹ আনা।
কাগজের মলাট—১৲ টাকা মাত্র।

সূচী।

বিষয়		পত্রাঙ্ক
অম্বিকার পথে	...	১
পরিচয়	...	৫
দীক্ষায়-দুঃখী কৃষ্ণদাস	...	১৫
তীর্থ পর্য্যটনে	...	২৯
ব্রজবাস	...	৩৮
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ	...	৫৫
পরীক্ষা	...	৭৯
গৌড়যাত্রা	...	৭৯
গ্রন্থোদ্ধার	...	১০৮
শ্রীরসিকমুরারি	...	১১৯
শ্রীনরোত্তম মিলন	...	১২৮
খেতরীর মহোৎসব	...	১৪০
শ্রীগোপীবল্লভপুর প্রকাশ	...	১৪৭
বিবাহ	...	১৫৫
ভক্তি-প্রচার	...	১৬০
শ্রীরাসোৎসব	...	১৬৬
মহানির্য্যান	...	১৭৪
শ্রীরসিকানন্দের শেষ কাহিনী	...	১৭৯
উপসংহার	...	১৮৮

182. Cc. 911. 1.
182 Ce. 911. 1.

শ্রীমৎ-শ্যামানন্দ-চরিত।

"কিবা বিপ্র, কিবা শূদ্র, ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীমধুসূদনদাস অধিকারি-প্রণীত।

জেলা হুগলী—পোঃ আলাটী,
"শ্রীবৈষ্ণব-সঙ্গিনী কার্য্যালয়" হইতে
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

মূল্য বাঁধাই—১৷০ আনা।
কাগজের মলাট—১৲ টাকা মাত্র।

27.AUG.12

১ ফর্ম্মা হইতে ১২ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত
১৬৭।৪।১, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
"জুবিলী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" শ্রীনারায়ণচন্দ্র হাজারী দ্বারা
এবং অবশিষ্ট,
৪৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, "বাণী প্রেসে,"
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

যাঁহার বিপুল প্রতিভাময় জীবনের অলৌকিক ভক্তি-কাহিনী সমুদ্রকেও স্তম্ভিত করে, সেই ভগবান্ রসিকানন্দদেবের বংশাবতংস,

শ্রীশ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের শীর্ষমণি,—

যিনি

গুরু-গৌরবে বহু ব্যক্তির পূজ্যতম হইয়াও ভক্তির স্বাভাবিক নম্র-তায় নিজেকে তৃণাদপি ক্ষুদ্র মনে করেন শ্রীপাট গোপী-বল্লভপুরের সেই বর্ত্তমান মোহান্তমহারাজ

আমার

পরমারাধ্যতম পরমাভীষ্টদেব

শ্রীল শ্রীযুক্ত নন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী প্রভুপাদের

শ্রীভগবৎ-সেবা-নিরত

শ্রীকর-কমলে

এই

ক্ষুদ্র শ্রীগ্রন্থ

হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত

অতি বিনীতভাবে সমর্পিত

হইল।

কৃপা-কাঙ্গাল—

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

—*—

যিনি প্রেমভক্তির উদ্দাম-তরঙ্গে সমগ্র উৎকল ও গৌড়াঞ্চল পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীশ্যামানন্দ-দেবের প্রেমময় জীবনের বিচিত্র-কাহিনী পাঠ করিবার অভিলাষ ও আগ্রহ ভক্তমাত্রেরই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহার বিমল চরিতাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে বিবৃত থাকায়, ভক্তগণ তাঁহার চরিতামৃত-আস্বাদনে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। এমন কি শ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ী অনেক ভক্ত, স্বসম্প্রদায়ের আদিগুরু শ্রীশ্যামানন্দদেবের বিষয় কিছুই অবগত নহেন। তাঁহাদের সেই অভাব ও অসুবিধা দূরীকরণার্থ যত না হউক, আত্মশোধনের নিমিত্তই আমি অযোগ্য হইয়াও এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তাদৃশ মহাপুরুষের প্রেমভক্তিরসময় চরিত্র-চিত্রণ মাদৃশ অল্পজ্ঞ অভক্তের পক্ষে একরূপ অনধিকার চর্চ্চা। এমনকি অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ, বৎসরাতীত হইল শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত-শ্রীনরোত্তম-চরিতাদি গ্রন্থ-প্রণেতা স্বনামধন্য গৌরগতপ্রাণ শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় মাদৃশ অধমের প্রতি যথেষ্ট কৃপা-স্নেহ প্রদর্শন করিয়া শ্রীশ্যামানন্দদেবের একখানি চরিত গ্রন্থ সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে আদেশ করেন। আমি সেই মহাত্মার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এই "শ্রীমৎ শ্যামানন্দচরিত" প্রকাশ করিলাম। কিন্তু হায়! তিনি এক্ষণে নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার এই সাধের "শ্যামানন্দ" তাঁহার

কর-কমলে অর্পণ করিতে পারিলাম না বলিয়া, অন্তরে চির আক্ষেপ রহিয়া গেল।

ভক্তিরত্নাকর (সাঙ্কেতিক চিহ্ন ভঃরঃ) নরোত্তমবিলাস (নঃ বিঃ) প্রেমবিলাস (প্রেঃ বিঃ) রসিকমঙ্গল (রঃ মঃ) ও শ্যামানন্দ প্রকাশ (শ্যাঃ প্রঃ) প্রধানতঃ এই কয়খানি গ্রন্থ হইতেই শ্রীশ্যামানন্দদেবের পবিত্র জীবনের অদ্ভুত ঘটনাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্রীশ্যামানন্দ সম্প্রদায়ের মস্তকমণিস্বরূপ, শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের বর্ত্তমান মোহান্ত মহোদয়ের নিকট হইতেও বহু বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ তিনি নিজ প্রীতিবশে কৃপাশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ প্রদান না করিলে আমি কখনই এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিতে পারিতাম না। এজন্য তাঁহার শ্রীচরণতলে হৃদয়ের প্রীতিভক্তির সহিত চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

শ্রীশ্যামানন্দদেবের সহিত শ্রীরসিকানন্দের চরিত্র ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। সুতরাং এই গ্রন্থে শ্রীরসিকানন্দের অলৌকিক জীবনকাহিনীও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের ইতিবৃত্তও উল্লিখিত হইয়াছে। ভক্ত-চরিত-লেখকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থে কেবল শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দের তীর্থোপম পূত-চরিত্র বর্ণনের নিমিত্তই যথাশক্তি যত্নপর হইয়াছি। ঐতিহাসিক গবেষণামূলক কোন তথ্য সংগ্রহ বা অপরাপর বহির্বিষয়ের ঘটনা সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের কোনরূপ প্রয়াস পাই নাই এবং ততটা প্রয়োজনও বোধ করি নাই। ভক্ত-জীবনে ভক্তির বিকাশ কিদৃশ, প্রধানতঃ তৎপ্রদর্শনই এই গ্রন্থের লক্ষ্য।

ভক্তচরিতের চারু-চিত্র অঙ্কিত করিবার ভাব ও ভাষাজ্ঞান আমার না থাকায়, গ্রন্থ মধ্যে বহুতর ত্রুটী থাকা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ কার্য্যের ক্ষিপ্রতাবশতঃ ভাল করিয়া "প্রুফ" দেখিতে না পারায় অনেক ভ্রম-

প্রমাদাদি রহিয়া গিয়াছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহা সংশোধনপূর্ব্বক গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, আমি সকল শ্রম সফল মনে করিয়া কৃতার্থ ও সুখী হইব।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ দানে উৎসাহিত করায় এবং "বাণী"-সম্পাদক বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গ্রন্থ-সম্পাদন বিষয়ে বিবিধ সহায়তা করায় তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত চিরঋণী রহিলাম। ইতি।

পশ্চিমপাড়া, আলাটী পোঃ,
জেলা হুগলী।
সন ১৩১৮।

বৈষ্ণবচরণ-রেণু-ভিখারী,
শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী।

সূচী।

বিষয়		পত্রাঙ্ক
অম্বিকার পথে	...	১
পরিচয়	...	৫
দীক্ষায়-দুঃখী কৃষ্ণদাস	...	১৫
তীর্থ পর্য্যটনে	...	২৯
ব্রজবাস	...	৩৮
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ	...	৫৫
পরীক্ষা	...	৭৯
গৌড়যাত্রা	...	৭৯
গ্রন্থোদ্ধার	...	১০৮
শ্রীরসিকমুরারি	...	১১৯
শ্রীনরোত্তম মিলন	...	১২৮
খেতরীর মহোৎসব	...	১৪০
শ্রীগোপীবল্লভপুর প্রকাশ	...	১৪৭
বিবাহ	...	১৫৫
ভক্তি-প্রচার	...	১৬০
শ্রীরাসোৎসব	...	১৬৬
মহানির্য্যান	...	১৭৪
শ্রীরসিকানন্দের শেষ কাহিনী	...	১৭৯
উপসংহার	...	১৮৮

মঙ্গলাচরণম্ ।

—ঃ**ঃ—

যং লোকা ভুবি কীর্ত্তয়ন্তি হৃদয়ানন্দস্য শিষ্যং প্রিয়ং
সখ্যে শ্রীসুবলস্য যং ভগবতঃ প্রেষ্ঠানুশিষ্যং তথা ।
স শ্রীমান্ রসিকেন্দ্রমস্তকমণিশ্চিত্তে মমাহর্নিশং
শ্রীরাধা-প্রিয়নর্ম্মমর্ম্মসুরুচিং সম্পাদয়ন্ ভাসতাং ॥

(শ্রীশ্যামানন্দশতকম্)

সান্দ্রানন্দনিধিঃ প্রস[illegible] ত্রৈলোক্যশোভানিধিঃ
পূর্ণ প্রেমরসামৃতাম্ব[illegible] সৌভাগ্যলক্ষ্মীনিধিঃ ।
সত্ত্বৈকমহানিধি-[illegible]ধিঃ কারুণ্যলীলানিধিঃ
শ্যামানন্দদয়ানিধি বি[illegible] মাধুর্য্যসম্পূর্ণধীঃ ॥

(শ্রীরসিকমঙ্গল) ।

শ্রীশ্রীরাধারমণোজয়তি।

শ্রীমৎ-শ্যামানন্দ-চরিত।

29 JUN 1911
WRITERS' BUILDINGS

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অম্বিকার পথে।

সন্ধ্যার মঙ্গল-আরতি বাজে নাই, শান্ত-স্তিমিত তপনের স্নিগ্ধারুণ কান্তি তখনও ধরণীর শ্যাম-বক্ষে ধীরে ধীরে ঝরিয়া পড়িতেছে। পিক্-পাপিয়াদি বিহগকুলের কলমধুর কণ্ঠ-তান বসন্তের মৃদু সমীর-প্রবাহে ভাসিয়া ভাসিয়া দিগ্‌দিগন্তে লুঠিয়া পড়িতেছে। সম্মুখে পবিত্র-তোয়া জাহ্নবী, মৃদু তরঙ্গভঙ্গে কলকল তানে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সেই সাগরাভিসারিণী ভাগিরথীর পবিত্র তট-পথে একটী তরুণ-বয়স্ক বালক আপনভাবে আত্মহারা হইয়া, আপন মনে, উদাস প্রাণে মৃদু গুন্‌গুন্-গাথা গাহিতে গাহিতে গমন করিতেছেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিলে বোধ হয়—পাগল যেমন কি এক অজ্ঞাত প্রাণের আবেগে কোন একদিকে উধাও ছুটিয়া যায়—এই বালকটীও সেইরূপ যেন কি এক মধুর আকর্ষণে—বুঝি বা কোন এক লুকান বস্তুর অন্বেষণে মাতোয়ারা হইয়া চলিয়াছেন। আশা-নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতে হৃদয়ে শতশত ভাবলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, সেই ভাবের আবেশে তিনি কখন ধীর-মন্থরে কখন বা দ্রুতভরে অগ্রসর হইতেছেন। যদিও অনাহারে,

শ্রমভারে তদুপরি প্রখররবি-করে তাঁহার স্নিগ্ধ কাঞ্চন-কান্তি অনেকাংশে বিমলিন হইয়াছে, তথাপি তাহা কত মধুর—কত নয়নানন্দ! প্রভাত-পঙ্কজের ন্যায় তাঁহার শ্রীমুখ-মণ্ডল কিছু ম্লান বোধ হইলেও তাহা সুন্দর, লাবণ্য-মাখা। তবু, যেন তাহাতে কত অকলঙ্ক শারদ-শশাঙ্কের সুধা-মধুরিমা পরিস্ফুট। সেই চলচল আয়ত-নয়ন, আর আজানুলম্বিত বাহুযুগল, সকলই সুন্দর, সকলই অনুপম। বিশেষতঃ তাঁহার হাস্য-ফুল্ল বদন-সৌন্দর্য্যে এবং নয়নের প্রীতিমাখা দৃষ্টি-মাধুর্য্যে এমন এক অপূর্ব্ব প্রতিভার ছবি প্রতিফলিত রহিয়াছে, তাহা দর্শন করিবামাত্র নয়ন-চকোরকে আর অন্যদিকে ধরিয়া রাখা যায় না। অবাধ্য নয়ন ঘুরিয়া ফিরিয়া যেন সে সৌন্দর্য্য-সুধা পান করিতে চাহে। আহা! দীন হীন কাঙ্গাল বেশে এই স্নেহমূর্ত্তি সুন্দর বালককে যিনি দেখি-য়াছেন, তাঁহারই হৃদয়ে স্নেহ, করুণা ও বিস্ময়ের তরঙ্গ খেলিতেছে; দেখিলেই প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়।

বালক ভাব-বিভোর হইয়া গমন করিতে করিতে ক্রমশঃ অম্বিকায় প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। গৃহস্থের গৃহে গৃহে মঙ্গলময় শঙ্খধ্বনি সন্ধ্যার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। অদূরে এক দেবালয়ে মধুর নামসঙ্কীর্ত্তনের সহিত মঙ্গল-আরতি বাজিয়া উঠিয়াছে—সে মঙ্গলধ্বনি হৃদয়ে প্রীতি, ভক্তি ও পবিত্রতার ভাব জাগাইয়া যেন শ্রবণে মধু ঢালিতেছে। বালক অত্যন্ত কৌতুহল-পরবশ হইয়া কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—ঐ সেই পতিত-পাবন শ্রীগৌর-সুন্দরের প্রিয়-পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ভবন—ঐ সেই তাঁহার প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির মঙ্গল মধুর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। বালক আনন্দে অধীর হইলেন। সেই শব্দ-লহরী লক্ষ্য করিয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের সঙ্কেত কুঞ্জে শ্রীগোবিন্দের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিরহ-

বিধুরা গোপ-বালিকা যেমন বংশীধারীর সঙ্গলাভ লালসায় আকুল প্রাণে, বিগলিত বেশে ধাবিতা হন, বালকও সেইরূপ প্রাণের আবেগে ছুটিয়া চলিলেন। লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইয়া যে অপরূপ দৃশ্য নয়নগোচর করিলেন তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা বিস্ময়-পাথারে ডুবিয়া গেল। সুন্দর শ্রীমন্দির!—আর সেই শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে নিখিল-সুন্দর শ্রীশ্রীগৌর নিতাইয়ের সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি! যেন শতকোটী নির্ম্মল পূর্ণ-চন্দ্র আর শত-কোটী স্নিগ্ধ-প্রভাত-তপন মিলিতরূপে শ্রীযুগলমূর্ত্তিতে উদিত হইয়াছেন। বালক সেই অনির্ব্বচনীয় অপার অপ্রমেয় রূপ-সাগরে পড়িয়া 'হাবুডুবু' করিতে লাগিলেন। এদিকে মনপ্রাণাকর্ষী কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন; সেই সঙ্কীর্ত্তনের সুধা-তরঙ্গে পড়িয়া আনন্দে কেহ নাচিতেছেন—কেহ কাঁদিতেছেন কেহ বা ধূলি লুণ্ঠিত হইয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ধূপ-দীপের মোহন সৌগন্ধে চারিদিক সুরভিত। বালক সেই সকল ব্যাপার দেখিতে দেখিতে—সেই সুধা-ঝরা নাম-সংকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ক্রমে অনির্ব্বচনীয় সুখ-সাগরে আপনার চিত্তকে হারাইয়া ফেলিলেন। বিবশাঙ্গে এক বিরল স্থানে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

*　*　*　*　*

"কোথা যায় কোথা থাকে কিছুই না জানে ॥
আর দিন অম্বিকাতে গেলা সন্ধ্যাকালে।
একাকী বসিলা তিহোঁ যাইয়া বিরলে ॥
সে ঠাকুর বাড়ীর শোভা অতি মনোহর।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ দেখি আনন্দ অন্তর ॥
আরতি করিছে কত শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি।
কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন বিনা, অন্য নাহি শুনি ॥
কেহ নাচে কেহ কান্দে গড়াগড়ী যায়।
সে সুখে ডুবিল চিত্ত লাগিল হিয়ায় ॥" প্রেঃ বিঃ।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। কি ভাবে, কোথায় দিয়া এই সুদীর্ঘ সময় চলিয়া গেল বালক তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভোজনের সময় হইল। ঠাকুরের সেবকগণ সমাগত বৈষ্ণবদিগকে সমাদরে বাটীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। বালক বহির্বাটীর একপ্রান্তে একাকী বসিয়া আছেন; সহসা এক সেবকের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত হইল। সেবক তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই! তুমি বসিয়া রহিলে যে? তোমার বাড়ী কোথায়?"

এই কথা শুনিয়া বালকের স্তব্ধভাব বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আমার বাড়ী দক্ষিণ দেশে, আমি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছি।"

বালকের মধুর বাক্যে সেবক সন্তুষ্ট হইয়া প্রসাদ পাইবার নিমিত্ত শ্রীঠাকুরহৃদয়চৈতন্যের আদেশ জানাইলেন। বালক শশব্যস্তে উঠিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—তাঁহার সেই প্রাণের ঠাকুর, যাঁহার শ্রীচরণ উদ্দেশে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া প্রাণে প্রাণে পূজা করিতেছিলেন, সেই আরাধ্য অভীষ্টমূর্ত্তি সম্মুখে!—কএকজন বৈষ্ণবের সহিত বসিয়া ইষ্টালাপ করিতেছেন। কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে তিনি কখন প্রেমানন্দে রোদন করিতেছেন—কখন বা হাস্য করিতেছেন,—

"দেখিল—ঠাকুর, বৈষ্ণবগণ সনে বসি।
কৃষ্ণকথা কহে, ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসি॥" প্রেঃ বিঃ।

ঠাকুরের সেই ভাব-বিহ্বলাবস্থা দর্শন করিয়া বালকের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল,—দারুণ পথ-ক্লেশ যেন কোন্ যাদুমন্ত্রে উড়িয়া গেল, অনশনক্লিষ্ট অবসন্ন দেহে নবশক্তির সঞ্চার হইল। মলিন বদন আশার আলোকে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ভক্তি-পুলকিত হৃদয়ে,

ছলছল সজল নয়নে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বচ্ছন্দে প্রসাদ পাইয়া আচমন করিলেন। অনন্তর যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া শয়ন করিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়-সরোবরে কত ভাব-তরঙ্গ—কত কল্পনার বুদ্‌বুদ্‌-মালা ফুটিয়া ফুটিয়া লয় পাইতে লাগিল, কে তাহা গণনা করে? কে তাহা বুঝাইতে পারে?——

"যাঁহার কৃপা-কণা লাভের জন্য পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, পরিজনকে ত্যাগ করিয়া এই সুদূর অপরিচিত স্থানে আসিলাম; প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমবোধে যাঁহার চরণপ্রান্তে বিকাইলাম; তাঁহার করুণা-বারি-ধারায় এ তাপিতজীবন শীতল হইবে না কি? তিনি কি এ অধমের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন।—তিনি যে অপার দয়া-নিধি! ভাল, এখানেই যদি থাকি, তবে ঠাকুরের কোন্ সেবা-কার্য্য সাধন করিয়া কালযাপন করিব?"—বালক পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

উড়িষ্যার অন্তর্গত দণ্ডেশ্বর গ্রামে দরিদ্র শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বাস। শ্রীকৃষ্ণ জাতিতে সদ্‌গোপ—আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয়। পূর্ব্ববাস গৌড়দেশে ধারেন্দাবাহাদুরপুরে ছিল। নানা কারণে উৎপীড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ অতি সাধের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি দণ্ডেশ্বর গ্রামে

আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সংসারে পরিজনের মধ্যে এক পত্নী, নাম শ্রীদুরিকা এবং একটী শিশু পুত্র। কেহ কেহ বলেন, এই শিশু ধারেন্দাগ্রামেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পাঠক! এই শিশুই আমাদের শ্যামানন্দ!——

"ধারেন্দাবাহাদুরপুরে পূর্ব্ব স্থিতি।
শিষ্ট লোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তথি॥" ভঃ রঃ।

শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল সামান্য অর্থের গৌরবে কাঙ্গাল হইলেও পরমার্থ ধনে মহাধনী। তাঁহার স্বভাব বড় শান্ত-মধুর, দেবদ্বিজে অগাধ ভক্তি। তাঁহার পত্নী দুরিকাও যেমন পতি-পরায়ণা তেমনই ভক্তিমতী। সাধু-সজ্জনের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিতে পাইলে তাঁহারা আর কিছুই চান না। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মই তাঁহাদের প্রাণের সর্ব্বস্ব। সংসারের এত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁহারা বেশ সুখী, বেশ সদানন্দ।——

"গোপকুলে শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়।
গৌড় ছাড়ি উড়িষ্যাতে করিলা আলয়॥
দণ্ডেশ্বর বলি নাম বড় পুণ্যস্থান।
সেই গ্রামে মহাশয় করিল নিধান॥
দুরিকা বলিয়া তাঁর পত্নী পতিব্রতা।
শান্ত দান্ত ক্ষমাশীলা সেই জগন্মাতা॥
পতি পত্নী দোঁহে তাঁরা ব্রহ্মণ্য-বিদিত।
সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ অতি শুদ্ধ চিত॥" রঃ মঃ।

তাই, "ভক্তিরত্নাকর" প্রণেতাও লিখিয়াছেন——

"সদ্গোপ কুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি সুচরিত।
কৃষ্ণ সে সর্ব্বত্র তার ভক্তে অতি প্রীত॥
শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল দুরিকার গুণগণ।
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে না হয় বর্ণন॥"

শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের অনেকগুলি পুত্রকন্যা হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীভগবানের কেমন ইচ্ছা, সকলগুলিই অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ইহা ভক্ত-শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কি সেই করুণানিধি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনল-পরীক্ষা!—না, অনন্ত করুণামৃত-ধারা বর্ষণ!! ভক্ত-শ্রীকৃষ্ণ স্নেহ-মূর্ত্তি সন্তানগণকে হারাইয়া বিচলিত হ'ন কিনা, শোকে তাপে হৃদয় গলিয়া পড়ে কি না,—চিন্তা-স্রোত শ্রীভগবানের চরণ-পদ্ম হইতে সংসারের এই সব তুচ্ছ মায়া-মমতার দিকে প্রধাবিত হয় কি না, জানিবার জন্যই কি এই কৌশল-কলা? না, ভক্তের ঐ সকল মায়ার স্বপ্ন—স্নেহের বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাকে 'মুক্ত' করিবার নিমিত্তই এই কৃপা-পূর্ণ লীলার অভিনয়! আমাদের ন্যায় 'বদ্ধ' জীব তাহার কি বুঝিবে?

ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল পুত্রকন্যার মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র কাতর নহেন। কালপূর্ণ হওয়ায় তাহারা বৃক্ষের ফলের মত আপন সুখে মৃত্যুর কোলে খশিয়া পড়িল, ভক্তের ভগবন্নিষ্ঠ-প্রাণ তাহাতে বিচলিত হইবে কেন?

প্রেমাবতার শ্রীগৌর-ভগবান অপ্রকট হইবার অল্পকাল পরেই শুভ চৈত্র-পূর্ণিমাতে অতি শুভক্ষণে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের এই শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েন।* পুত্রের মহাপুরুষ-সুলভ লক্ষণ-নিচয় ও নয়নানন্দ রূপ-মাধুর্য্য দর্শন করিয়া ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল যারপরনাই আনন্দিত হইলেন। তিনি অতি যত্নসহকারে পুত্রের লালন পালন করিতে পত্নীকে উপদেশ দিলেন।—যদি কৃষ্ণ কৃপা করিয়া এবার এই পুত্রটী রক্ষা করেন, ইহাই মনের অভিলাষ।——

"চৈত্র পূর্ণিমাতে জন্মিলেন শ্যামানন্দ।
দিনে দিনে বাঢ়িলেন যৈছে বাঢ়ে চন্দ্র॥

* শ্যামানন্দ ঠিক কত শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার নিঃসন্দেহ নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন ১৪৫৬ শকে তাঁহার জন্ম হয়। আমরাও এ অনুমান নিতান্ত অমূলক বোধ করি না।

যে দেখে বারেক-তার মহানন্দ মনে।
জন্মিলেন শ্যামানন্দ অতি শুভক্ষণে॥
পুত্র তেজ দেখি কৃষ্ণ কহয়ে পত্নীরে।
করহ যতন যদি কৃষ্ণ রক্ষা করে॥" ভঃ রঃ।

জননীর স্নেহ-ক্রোড়ে শিশু দিন দিন নবশশি-কলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। শিশুর সেই অকলঙ্ক চাঁদের মত প্রফুল্ল মুখখানি যে একবার দেখে, সে আর নয়ন ফিরাইতে পারে না—মহানন্দে তাহার হৃদয় ভরিয়া যায়। দুঃখ দারিদ্র্যের শত অভাবের মধ্যেও শিশুর সেই হাস্য-ফুল্ল বদন দর্শন করিলে, পিতামাতার সে অভাব যেন নিমেষে পূর্ণ হইয়া উঠে—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি যেন কি এক অপার্থিব আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া যায়। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বালক লালিত পালিত হইলেন বলিয়া এবং পুনঃপুন পুত্র-বিয়োগবিধুরা জননীর অতি দুঃখের ধন বলিয়াই প্রতিবেশিনী রমণীগণ বালকের নাম প্রথমে "দুঃখী" বা 'দুখিয়া' রাখিলেন।——

"গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বারবার।
এখন দুখিয়া নাম রহুক ইহার॥
মাতা পিতা দুঃখ সহ পালন করিল।
এই হেতু "দুঃখী" নাম প্রথম হইল॥" ভঃ রঃ।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 'দুঃখীর' অনিন্দ্য-সুন্দর শৈশব-লাবণ্য যেন শতধারে উথলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই খঞ্জন-গঞ্জন চটুলায়ত নয়ন-দুটী, সেই প্রবলারুণ অধরপুটে লহু লহু সরস হাসি আর স্বর্গের সুধা-মাখা আধ আধ কথা, মরি! মরি! সকলই মাতাপিতার তাপিত প্রাণে আনন্দের অমৃতধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। দুঃখের ধন দুঃখীয়াকে পাইয়াই তাঁহাদের দুঃখের সংসার যেন সুখ-শান্তির বিলাস মন্দির হইয়া উঠিল।

ভক্ত শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল যথাসময়ে পুত্রের অন্নপ্রাশন-চূড়াকরণাদি করণীয় সংস্কারগুলি যথারীতি সম্পাদন করাইলেন। দেখিতে দেখিতে 'দুঃখী' শৈশবদশা অতিক্রম করিয়া পৌগণ্ডে পদার্পণ করিলেন। শুভক্ষণে তাঁহার 'হাতে খড়ি' হইল। অদ্ভুত ধীশক্তি ও অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন।——

"কথন না যায় অন্য বালকের মেলে।
ব্যাকরণ আদি পাঠ হইল অল্পকালে॥
দিনে দিনে বাড়ে দেখি সভার উল্লাস।
পরম অদ্ভুত চেষ্টা হইল প্রকাশ॥" ভঃ রঃ।

দুঃখীর বিনয়-মধুর ব্যবহারে এবং সারল্য-সুশীলতায় প্রতিবাসী সকলেই তাঁহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণ-সৌরভে শত্রুমিত্র সকলেই মুগ্ধ, সকলেই তাঁহার পক্ষপাতী। বিশেষতঃ তাঁহার কৃষ্ণানুরাগের অদ্ভুত চেষ্টা সকল সন্দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়-বিমোহিত। দুঃখী বৈষ্ণবগণের মুখে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই-সীতানাথের ও তাঁহাদের পার্ষদভক্তগণের পূত-মধুর চরিত-গাথা এবং সুধা-মধুর কৃষ্ণ-কথা সকল শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমে কৃষ্ণানুরাগের প্রবল তরঙ্গে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া উঠিলেন। নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন ভিন্ন, তাঁহার আর কিছুই ভাল লাগে না। অথচ মাতাপিতার প্রতি তাঁহার অবিচলা ভক্তি। তিনি শ্রদ্ধা-পূত হৃদয়ে সাবধানে তাঁহাদের সর্ব্বদা সেবা করেন।——

"গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈতগণের চরিত।
বৈষ্ণবের মুখে শুনে হৈয়া সাবহিত॥
নিরন্তর সেইগুণ করয়ে কীর্ত্তন।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দু'নয়ন॥

সদা রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত করে পান।
পিতা মাতার সেবায় অত্যন্ত সাবধান॥" ভঃ রঃ।

*　*　*　*　*

"সদাই বৈরাগ্য-চিত কৃষ্ণ অনুরাগে।
নয়নের জলে তাঁর সর্ব্ব অঙ্গ ভিজে॥
কৃষ্ণরসাবেশে প্রভু আপনা না জানে।
দিবানিশি কৃষ্ণ বলি কান্দে অনুক্ষণে॥
গৃহাসক্ত সুখ জানে বিষের সমানে।
কিছুই না ভায় তাঁরে একা কৃষ্ণ বিনে॥" রঃ মঃ॥

কৃষ্ণানুরাগের উদ্দাম-তরঙ্গে হৃদয় যত উদ্বেলিত হইতে লাগিল, বৈরাগ্য-পিপাসাও দিন দিন তত প্রবলতর বাড়িতে লাগিল। তিনি ক্রমশঃই অধীর—উন্মনা হইয়া পড়িলেন। পুত্রের ভাবগতি দেখিয়া ভক্ত শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; বরং ভাবিলেন—"আমার দুখিয়ার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি ধন্য, তাঁহার পিতা-মাতাও কৃতার্থ, তাঁহার স্বর্গবাসী পূর্ব্বপিতৃপুরুষগণ পর্য্যন্ত বংশে কৃষ্ণভক্ত জন্মিয়াছেন দেখিয়া, আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। অতএব ভালই হইয়াছে। আমার দুখিয়া দুষ্ট-সঙ্গী না হইয়া কৃষ্ণানুরাগী হইয়াছে।"—তাই, একদিন পুত্রকে ডাকিয়া উপদেশ দিলেন—"বাছা! তোমার উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, এক্ষণে যাঁহাকে ভক্তি হয়, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাগ্রহণ কর।"—

"পিতামাতা পুত্রে যোগ্য দেখিয়া কহয়।
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লহ যথা মনে লয়॥" ভঃ রঃ।

দুখিয়ার প্রাণ তো ইহাই চায়! তিনি পিতামাতার বাক্যে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। অকপটে মনের অভিলাষ ব্যক্ত

করিয়া কহিলেন—

"শুনিয়া দোঁহার বাক্য কহে জোড়হাতে।
মোর প্রভু হৃদয়চৈতন্য অম্বিকাতে॥
প্রভু গৌরিদাস পণ্ডিতের শাখা তেঁহো।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রিয় যেঁহো॥
তাঁর গৃহে সাক্ষাৎ বিহরে দুই ভাই।
তথা শিষ্য হই গিয়া যদি আজ্ঞা পাই॥
যদি কহ দূরদেশ যাইব কেমনে।
তা'তে এক যুক্তি মুঞি বিচারিনু মনে॥
দেশবাসী লোক বহু গঙ্গাস্নানে চলে।
কোনই সন্দেহ নাই সেই সঙ্গে গেলে॥
মোরে আজ্ঞা দেহ দোঁহে হইয়া সদয়।
মোর যত অভিলাষ যেন সিদ্ধ হয়॥" ভঃ রঃ।

পিতামাতা সহাস্যবদনে—"বাছা! কৃষ্ণের ইচ্ছায় তোমার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু সুদূর অম্বিকার পথে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে একাকী ছাড়িয়া দিতে পিতামাতার স্নেহ-কোমল প্রাণ কিছু সঙ্কুচিত ও কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ এই উপলক্ষেই বা স্নেহের দুঃখী, কঠোর বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়া গৃহবাস পরিত্যাগ করেন—এইরূপ আশঙ্কায় ও উদ্বেগে তাঁহাদের ভক্তি-বিভাবিত অটল হৃদয়ও বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা অম্বিকা যাইতে মুখে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন বটে, কিন্তু যাহাতে তিনি গৃহের বাহির হইতে না পারেন, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবকে তাঁহার গতি-বিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিলেন এবং নিজেরাও সর্ব্বদা নয়নে নয়নে রাখিতে লাগিলেন। তখন চক্ষুর পলকান্তরালও তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল।

বর্ষার বারিধারা-পুষ্টা স্রোতস্বিনীর প্রবাহ সহসা প্রতিহত হইলে যেমন তরতরবেগে দুকূল প্লাবিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, সেইরূপ দুখিয়ার অনুরাগ-প্রবাহও সহসা বাধা প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ের কূলেকূলে ফুলিতে লাগিল—আশা-নৈরাশ্যের ও হর্ষ-বিমর্ষের ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষণে ক্ষণে দুলিতে থাকিল এবং তরঙ্গ-তাড়িত তৃণের ন্যায় সেই বাধাকে কোন্ দিকে ভাসাইয়া দিয়া আপনভাবে প্রবাহিত হইবার নিমিত্ত প্রতিক্ষণই শুভ অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল।——

"বাহির হইতে প্রভু করেন যতন।
ছাড়িয়া না দেয় কেহ সর্ব্ব বন্ধু জন॥
তবে প্রভু সবারে কহিল বিবরণ।
'কৃষ্ণ অনুরাগে আমি করিব ভ্রমণ॥
ব্রজপুরী দেখিব কৃষ্ণের নিজ ধাম।
তাহা সঙরিলে মোর না রহে পরাণ॥
কিছু না বলিবে মোরে শুন সর্ব্বজন।
অবশ্য করিব আমি তীর্থ পর্য্যটন॥
পৃথ্বী পরিক্রমা আমি করিব নিশ্চয়।
তাহা শুনি বন্ধুগণ পাইলা বড় ভয়॥" রঃ মঃ।

অনুরাগে আত্মহারা দুঃখী, সদ্য-পিঞ্জরাবদ্ধ বন-বিহঙ্গের মত প্রতিক্ষণই গৃহ-পিঞ্জর হইতে পলাইয়া শ্রীগুরুর শ্রীচরণকমলকুঞ্জে জুড়াইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। পিতামাতার অপার স্নেহ-মমতা, বন্ধুবান্ধবের প্রীতি-সৌহার্দ্দ্য, তাঁহার দুর্ব্বার অনুরাগের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল। বৈরাগ্যের কষ্ট-কঠোরতা ভাবিয়া তাঁহার কুসুম-কোমল বালক-হৃদয় মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইল না।

দুখীর কনিষ্ঠ সহোদরের নাম—বলরাম। তিনিই বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা ও গৃহের সমস্ত কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন। আর দুঃখী কেবল

সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে শাস্ত্রচর্চ্চা ও ধর্ম্মালোচনায় কালযাপন করেন। দুঃখীর ন্যায় বলরামও শান্ত, দান্ত ও ধর্ম্মশীল।—

"প্রভুর অনুজ বলরাম মহাশয়।
শান্ত দান্ত তেঁহো অতি নির্ম্মল-হৃদয়॥
তাঁহারে দিলেন সব গৃহ-ব্যবহার।
আপনি বৈরাগ্য লয়ে হইলা বাহার॥" রঃ মঃ।

আত্মীয় স্বজন দুঃখীকে পুনঃপুন বাধা দিয়া রাখিতে লাগিলেন কিন্তু দুর্ব্বার সাগর-তরঙ্গ কি বালির বাঁধে অবরুদ্ধ থাকে?—

"নানাবিধ উপায় করয়ে বন্ধুগণ।
রাখিতে অনেক রূপে করিলা যতন॥
বালি বান্ধে বান্ধা নহে সাগর তরঙ্গ।
সে বৈরাগ্য কার সাধ্য করিতে পারে ভঙ্গ॥" রঃ মঃ।

ফাল্গুন মাসের রাত্রি, তখনও প্রভাত হয় নাই। প্রকৃতি নিস্তব্ধতায় গাঢ়-গভীরতায় নিমগ্ন। বাটীর আত্মীয় পরিজন সকলেই নিদ্রিত। দুঃখী সেই গভীর নিশীথে পিতামাতার চরণোদ্দেশে বিদায়-প্রণাম করিয়া, সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীভগবানের নাম লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।—

"পূর্ব্ব উপার্জ্জিত সাধন আছিল ইহার।
তাহা বিনা হেন দশা হয় বা কাহার॥
বিরক্ত হইল চিত্ত, কৃষ্ণ পাই কি প্রকারে।
অবশ্য চাহিয়ে আমি গুরু করিবারে॥
রাত্রে উঠি সংসার ছাড়ি গেল দূরদেশ।
সব দূর কৈল, নৈল বৈরাগীর বেশ॥" প্রেঃ বিঃ।

রজনী প্রভাত হইল। দুঃখীকে দেখিতে না পাইয়া সকলেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। যখন বহু অন্বেষণেও দুঃখীর দেখা পাওয়া গেল না,

তখন সকলের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল, বুঝিলেন,—দুঃখী পিতামাতাকে অপার দুঃখসাগরে ভাসাইয়া নিশ্চয়ই গৃহ-ত্যাগ করিয়াছেন। স্নেহ-কোমলা দুরিকা ধরায় লুণ্ঠিতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলও বিষাদের উষ্ণ-অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আনন্দের ভবন বিলাপের করুণ-ধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া গেল।—সুখ-শান্ত সোণার সংসার শোকের তুমুল ঝটিকায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

অনুরাগের অদম্য আকর্ষণে দুঃখী দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া উধাও ছুটিয়া চলিলেন। প্রাণের আবেগে ঘনঘন পাদ-বিক্ষেপে সেই রাত্রির মধ্যে বহুপথ অতিক্রম করিলেন। কত নদনদী, কত পল্লী-প্রান্তর, কত শ্বাপদসঙ্কুল বন্ধুর বনভূমি পশ্চাতে রাখিয়া চলিলেন, কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। সহায় নাই, শ্রীগুরুর চরণচিন্তাই তাঁহার একমাত্র ভরসা। অন্য সম্বল নাই, শ্রীভগবানের নামই তাঁহার প্রচুর সম্বল—সুদূর দুর্গম-পথের ইহাই একমাত্র মূল্যবান পাথেয়। দুঃখী মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ নাম গাহিতে গাহিতে বামদিগের পথ ছাড়িয়া পূর্ব্ব-উত্তর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নাড়াদেউ নামক গ্রামে উপনীত হইলেন। পরে তথা হইতে মেদিনীপুরের অন্তর্গত চেতুয়ানগর পার হইয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীঅভিরামের পাটে উপস্থিত হইলেন। তথায় "শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ" দর্শন করিয়া নয়ন-মন সফল করিলেন।——

"বামে পথ ছাড়ি দিয়া তলপথে যায়।
কতক দিবসে গ্রাম নাড়াদেউ পায়॥
চেতুয়া নগর দিয়া খানাকুল যায়।
গোপীনাথ দর্শন করি মহাসুখ পায়॥
ভাগ্য করি মানে পাট করিয়া দর্শনে।" প্রেঃ বিঃ।

অনন্তর তথা হইতে দুঃখী, চির-আকাঙ্ক্ষিত আশা বুকে লইয়া প্রবল উৎকণ্ঠায় অম্বিকার পথে ছুটিতে লাগিলেন। সুধা-মধুর কৃষ্ণ-নামামৃত পানে সুদূর পথশ্রান্তি ও ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি শারীরিক ধর্ম্ম যেন একবারে ভুলিয়া গেলেন।

পাঠক! অম্বিকার পথে যে বালক, প্রেমে অবশাঙ্গ অশ্রু-ভরা ছলছলআঁখি দীনবেশে চঞ্চল-চরণে গমন করিতেছিলেন—সেই বালকই এই আমাদের শ্রীদুরিকা-নন্দন—দুঃখী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দীক্ষায়—দুঃখী-কৃষ্ণদাস।

নিশা অবসান হইল। ঊষার অরুণ-প্রভায় পুলকিত-তনু বিহগ-নিচয় তরু-শাখায় বসিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রভাতী গাহিল। শিশির-সম্পৃক্ত মলয়সমীরের মৃদুহিল্লোলে ঘুমন্ত বিশ্ব ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। সেই ব্রাহ্ম্য-মুহূর্ত্তে অম্বিকায় গৌরীদাসপণ্ডিত-ভবনে বালক দুঃখী শ্রীগুরু স্মরণ করিয়া "জয় শ্রীরাধাশ্যাম" বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অতি পবিত্রমনে মার্জ্জনী লইয়া রাসমণ্ডপে উপনীত হইলেন। দুঃখীর হৃদয়ে আজ আনন্দ ধরে না। অপর সেবকগণ জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি রাসমণ্ডপে ঝাঁটি দিতে আরম্ভ করিলেন এবং আনন্দে বিভোর হইয়া আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন। আহা! এই ভাব কি মধুর! ইহা দর্শন করিলে আমাদের প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌর-সুন্দরের গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা স্বতঃই মনে উদিত হয়। তিনি না

একদিন স্বহস্তে ঝাড়ু ধরিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, আপনি যজিয়া জীবকে ভক্তির এই এক সুন্দর সেবা-অঙ্গ শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই বুঝি, আজ দুঃখী, প্রভুর সেই শিক্ষা হৃদয়ে ধরিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিতাইয়ের রাসমণ্ডপ মার্জ্জনা করিতেছেন? সাধক যেমন স্বীয় সাধনবলে হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তিরূপ আবর্জ্জনা দূর করিয়া থাকেন। দুঃখীও আজ সেইরূপ রাসমণ্ডপের আবর্জ্জনাগুলি দূরে ফেলিয়া দিলেন। এই সময়ে শ্রীহৃদয়চৈতন্যঠাকুর বহির্বাটিতে আসিয়া বিদেশী বালকের এই পবিত্র চেষ্টা—এই নির্ম্মল কার্য্য দর্শন করিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। প্রসন্নচিত্তে "ভাল ভাল" বলিয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন——

"————হইল বিহান।
রাসমণ্ডলে ঝাঁটি দেন করে কৃষ্ণগান॥
হেনকালে ঠাকুর আইসে দণ্ডবৎ করে।
দর্শন করিল তাঁরে আনন্দ অন্তরে॥
নিরখিয়া রূপ পুনঃ করয়ে প্রণাম।
'ভাল ভাল' বলি ঠাকুর অন্তঃপুরে যান॥" প্রেঃ বিঃ।

ভক্তি-অঙ্গ-সমূহের মধ্যে শ্রীভগবন্মন্দির মার্জ্জনও একটী প্রধান অঙ্গ। দুঃখী অকপট-চিত্তে প্রত্যহ শ্রীরাসমণ্ডল মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভক্তজন-দুর্লভ সুনীচভাব—দীনবেশ আর সেই সেবা-পারিপাট্যের অপূর্ব্ব চেষ্টা দর্শন করিয়া একদিন শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু অতিশয় প্রীত হইয়া দুঃখীকে নিকটে ডাকিলেন। দুঃখী ভীত-সঙ্কুচিত কম্পিত কলেবরে নিকটে গিয়া তাঁহার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং অবনত মুখে করযোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।——

"অতি নির্ম্মল কার্য্য করে দেখি সুখ পায়।
আর একদিনে ঠাকুর ডাকিলা তাহায়॥

সম্মুখে যাইয়া কৈল প্রণাম বিস্তর।
কাঁপিছে শরীর, জুড়ি রহে দুই কর॥" প্রেঃ বিঃ।

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য এই অদ্ভুত বৈরাগ্য-লক্ষণযুক্ত বালকের অলৌকিক প্রতিভাব্যঞ্জক স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি অনিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দর্শন করিলেন। দেখিতে দেখিতে স্নেহের অমৃত-উচ্ছ্বাসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন—"বাপু! তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার নামই বা কি? উদাসীন হইয়াছ, তোমার সংসারে কি কেহ নাই।"

দুঃখী কি উত্তর করিবেন, সহসা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কেবল অশ্রু-ছলছল-নয়নে ঠাকুরের বদনপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর অতি দৈন্য-সহকারে বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! এজগতে আমার কেহই নাই। দুঃখীর ঘরে জন্মিয়া আশৈশব দুঃখেই প্রতিপালিত হইয়াছি, তাই আমার নাম 'দুঃখী।' এক্ষণে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া অবধি পরম সুখী।"

এই কথা শুনিয়া প্রভু শ্রীহৃদয়চৈতন্য একটু বিস্মিত হইলেন—ভাবিলেন—এ বালক অপূর্ব্ব বটে! সে দিন আর অধিক কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। বলিলেন—"বাপু! তবে তুমি আর কোথাও যাইও না। এইখানে প্রসাদ পাইবে, আর স্বচ্ছন্দে থাকিবে।"

দুঃখী ইহাই তো চান, ইহাই তো তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সম্মতি জানাইলেন। ঠাকুর হৃষ্ট-চিত্তে অনুজ্ঞা করিলেন—"শুন বাপু! তোমাকে আর অন্য কিছু কার্য্য করিতে হইবে না। আজ হইতে তুমি এই পূজারীর সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে।" এই বলিয়া ঠাকুর, পূজারীকেও বালকের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিলেন—

"অপূর্ব্ব বালক দেখি সুখ বড় পাইল।
পূজারী সেবাতে থাক, আপনে কহিল॥

'উহাকে প্রসাদ দিবে স্বচ্ছন্দ করিয়া।'
সেবা কর বাপু, এই স্থানেতে রহিয়া॥
দিবসে দিবসে সেবা অধিক বাঢ়িল।
দেখিয়া সবার চিত্তে সুখ বড় হৈল॥" প্রেঃ বিঃ।

একদিন ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য নাট-মন্দিরে বসিয়া আছেন। অদূরে বালক দুঃখী, স্বীয় কর্ত্তব্য সেবায় গাঢ় নিবিষ্ট। ঠাকুর তাঁহার সেই সেবা-কুশলতা দেখিয়া মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি দুঃখীকে কাছে ডাকিয়া পুনরায় বিশেষ পরিচয় চাহিলেন—

"বৎস! বাস্তবিকই কি সংসারে তোমার আর কেহ নাই?"

বালক ধীরভাবে উত্তর করিলেন——

"প্রভু আছেন সংসারে, সত্যচরণ তোমার।"

এই নশ্বর সংসারে ভাই, বন্ধু, পতি, পত্নী, এমন কি মাতা পিতা পর্য্যন্ত কেহ কাহারও আপনার নয়। সংসারে তাহাদের সহিত সম্বন্ধ ঠিক ছায়া-শীতল বৃক্ষতলে পথিকের সহিত পথিকের পরিচয় মাত্র। শ্রান্তিদূর হইলেই তাহারা যেমন আপনাপন গন্তব্য পথে চলিয়া যায়, সেইরূপ জন্মান্তরীণ ঋণ পরিশোধ হইলেই কোন ব্যক্তি আর সংসারে অবস্থান করে না। দুঃখীর মাতা পিতা সহোদর সকলই আছেন, তথাপি বলিলেন,—"আমার এ সংসারে আর কেহই নাই প্রভো! "আমার" বলিতে আপনই আছেন; আপনার শ্রীচরণই সত্য।"

সংসারে যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন, তাঁহার জীবনই ধন্য! এ সংসারে তাঁহারই আসা সার্থক। আবার শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ই শ্রীকৃষ্ণ ভজনের মূল। শ্রীগুরুর সহিত যে সম্বন্ধ—যে বন্ধন, তাহা নিত্য,—অবিচ্ছিন্ন। তাই, দুঃখী—"সংসারে 'আমার' বলিতে প্রভু, আপনি আছেন" বলিয়া অন্তরের গূঢ় অভিপ্রায় আভাসে পরিব্যক্ত করিলেন।

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য দুঃখীর মনোভাব বুঝিলেন। বুঝিয়াও সন্দেহ

বিরসনের জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপু, তুমি কাহার সেবক? তোমার গুরু-পরিবার কি?"

দুঃখী অশ্রু-প্লুত-লোচনে করযোড় করিয়া কহিলেন—"প্রভো! সংসারে আমার আর কেহই নাই, আপনার শ্রীচরণকমলই আমার একমাত্র গতি। কৃপা করিয়া দাসকে শ্রীচরণে আশ্রয় দান করুন।"

"কেহ নাহি সংসারে প্রভু মুঞি অতি দীন।
কহিবার যোগ্য নহে তাহে ভক্তিহীন॥
তোমা বিনা পতিত পাবন কেবা হয়।
কৃপা করি দেহ অভয় চরণ আশ্রয়॥" প্রেঃ বিঃ।

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর বুঝিলেন যে, দুঃখী যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার দাসানুদাস হইবেন। এজন্য ঠাকুর, দুঃখীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে দিনের পর দিন যায়, দুঃখীর উৎকণ্ঠা ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। একদিন ঠাকুর একাকী বসিয়া আছেন। দুঃখী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া যোড়হস্তে বলিলেন—"প্রভো! দীনহীন পতিত পাষণ্ডকে উদ্ধারের জন্যই আপনার অবতার; আমার ন্যায় অধম পতিত সংসারে আর কেহই নাই। আমার কি উদ্ধার হইবে না প্রভো!" এই বলিয়া দুঃখী ঠাকুরের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, অশ্রু-ধারায় তাঁহার শ্রীচরণ-কমল পরিসিক্ত হইল। দুঃখীর এইরূপ প্রাণভরাভক্তি, গাঢ়-শ্রদ্ধা, আর হৃদয়-দ্রবকরা আর্ত্তিদর্শন করিয়া ঠাকুরের চিত্ত স্নেহরসে গলিয়া গেল। তিনি সেই দণ্ডে দুঃখীকে শ্রীহরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

"কৃপা হৈল প্রভুর, ডাকিল সন্নিধানে।
মস্তক ধরিয়া হরিনাম দিলা কাণে॥" প্রেঃ বিঃ।

দুঃখীর আনন্দ-বাষ্পে কণ্ঠরুদ্ধ; তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেবল অশ্রু-পরিপ্লুত নয়নে—ঠাকুরের চরণ প্রান্তে পড়িয়া

পুনঃপুন প্রণাম করিতে লাগিলেন। ঠাকুরও প্রেমাবিষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তকে শ্রীচরণরেণু প্রদান করিলেন। দুঃখী সেই কৃপা-রেণু স্পর্শে কৃতার্থ হইয়া গেলেন। এই হইতেই ঠাকুর, দুঃখীকে আপনার সেবা-কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন।—

"সেই হৈতে নিজ সেবা করিতে আজ্ঞা হৈল।
দিনে দিনে চেষ্টা প্রীতি বাড়িতে লাগিল॥
বৈষ্ণবে সাবধান অতি কৃষ্ণনামে রতি।
প্রভুরে দেখিলে যোড়হাতে করে স্তুতি॥" প্রেঃ বিঃ।

দেখিতে দেখিতে শুভ ফাল্গুনী-পূর্ণিমা—সেই কলিপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের শুভ জন্মতিথি আসিয়া উদিত হইল। চারিদিকেই আনন্দের উল্লাস-তরঙ্গ! গৃহে গৃহে অনাবিল আনন্দ-কোলাহল, কণ্ঠে কণ্ঠে সুধা-মধুর হরিনাম কীর্ত্তনধ্বনি। বাস্তবিকই বিশ্ব-চরাচর যেন সে আনন্দ-তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। পাখী ডাকে, বায়ু বহে, তাহাও যেন সেই আনন্দ-তরঙ্গের তালে তালে। দুঃখীর আজ আনন্দের সীমা নাই। এই আনন্দের দিনে—এই আনন্দময়ের শুভ জন্মতিথিতেই তাঁহার জীবনাকাশে সৌভাগ্যের শুভ্র-জ্যোৎস্না হাসিবে,—ঠাকুর তাঁহাকে আজ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিবেন।

ঠাকুরের কৃপা-ইঙ্গিত পাইয়া দুঃখী গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। ঠাকুর যথাবিধানে দুঃখীকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই শ্রীহরিনাম মন্ত্র দিয়া তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্রকে পরিশোধিত ও প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজ তাহাতে বীজ নিহিত করিলেন। যথাস্থানে ও যথাসময়ে উপযুক্ত বীজ পড়িলে যেমন তাহার অঙ্কুরোদ্গম শীঘ্রই হইয়া থাকে, সেইরূপ মন্ত্র-দীক্ষামাত্র তাঁহাতে এক অপূর্ব্ব ভাবোদ্গম পরিদৃষ্ট হইল। তাঁহার পুলকাঞ্চিত কান্ত-কলেবর পবনান্দোলিত বেতসীর ন্যায় থরথর কাঁপিতে লাগিল। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা বহিল। উদ্দাম

প্রেমাবেশে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। যিনি আনন্দের অকূল পাথারে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার কি বাক্যস্ফুরণের শক্তি থাকে? তিনি ঠাকুরের চরণকমলে প্রণাম করিতে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বালকের এই অসামান্য ভাবাবেশ দর্শন করিয়া ঠাকুর বিস্মিত হইলেন। অনন্তর দুঃখীকে শান্ত করিয়া কহিলেন—"বাপু! তুমি সেই ফুল্লেন্দীবরকান্তি ইন্দুবদন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র প্রত্যহ শতবার জপ করিবে।"

এই বলিয়া কৃষ্ণ-ভজনের যে সকল পদ্ধতি আছে তাহা বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন। আরও কহিলেন—"বৎস! আমি তোমার অকপট কৃষ্ণভক্তি ও গাঢ়নিষ্ঠা দেখিয়া বুঝিয়াছি—তুমি যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের দাস। অতএব আজ হইতে তোমার নাম 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' রাখিলাম।"

প্রেমবিলাসে লিখিত আছে——

"কৃষ্ণমন্ত্র কৃপা কৈল হাতে হাত ধরি।
শতবার জপিবা মন্ত্র কৃষ্ণ ধ্যান করি॥
ভজনের যেই রীতি কহিল সকল।
অশ্রু নয়নে বহে পুলক অবিরল॥
পুনঃপুন দণ্ডবৎ করয়ে প্রণামি।
সত্য কৃষ্ণ পদযুগ সত্য কৃষ্ণনাম॥
আজি হৈতে তোমার নাম দুঃখী কৃষ্ণদাস।
সেবা কর মোর এই স্থানে করি বাস॥"

ধন্য কৃষ্ণদাস! ধন্য তোমার সাধনা! জীবের স্বরূপ—নিত্য কৃষ্ণদাস; আজ শ্রীগুরুর প্রসাদে তুমি স্বরূপ ও নামে অভেদত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলে, আজ প্রকৃতই তোমার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবেশ অবতার সার্থক হইল।

তটস্থ দশায় দুঃখী নাম ছিল। আর এই সাধক দশায় তিনি 'কৃষ্ণদাস' নাম প্রাপ্ত হইলেন। অতএব এবার হইতে তাঁহার সাধক-জীবনের আখ্যায়িকায় 'দুঃখী' নামের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে 'কৃষ্ণদাস' বা 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' নামেই অভিহিত করা হইবে।

কৃষ্ণদাসের অনুরাগ ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। দিবানিশি কৃষ্ণনামে বিভোর; প্রেমভক্তির অনন্ত-পিপাসায় উন্মাদিত হইয়া দিবানিশি শ্রীকৃষ্ণের অনন্তস্বরূপে নিমগ্ন। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, কেবল সেই প্রেমামৃত পানেই আত্মহারা। কৃষ্ণদাসের এই অনাবিল, অতুল কৃষ্ণ-ভক্তির কথা লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে জল্পিত হইতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠিলেন।—

"সেইদিন হৈতে কৃষ্ণনামে অনুরাগী।
নিভৃতে বসি কৃষ্ণনাম লয় রাত্রি জাগি॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা বাদ হৈল প্রেমামৃত পান।
যাঁর সাধনের কথা বৈষ্ণবে করে গান॥"

কৃষ্ণদাসের গুরুভক্তি অতুলনীয়। তিনি প্রাণভরা প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিবানিশি শ্রীগুরুর চরণসেবায় ব্যাপৃত। ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য, কৃষ্ণদাসের এইরূপ নম্র-প্রকৃতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভক্তি দর্শন করিয়া যারপর নাই সুখী হইলেন। তিনি একদিন কৃষ্ণদাসকে নিকটে বসাইয়া স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের মহিমার কথা বলিতে লাগিলেন।—

"আমার প্রভুর কথা শুন বাপু আর।
চৈতন্য নিত্যানন্দ হন জীবন যাঁহার॥
কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্ম সখা সুবল ঠাকুর।
সেই প্রভু গৌরীদাস প্রেমের অঙ্কুর॥
চৈতন্য নিত্যানন্দের দিবানিশি সঙ্গে।
সহিতে না পারি তাঁর প্রেমের তরঙ্গে॥

সাক্ষাতেই দুই প্রভুর বিরহ প্রকাশ।
পূর্ব্বাপর সঙ্গে যাঁর সদাই বিলাস ॥
বিগ্রহ প্রকাশ করি করাইল ভোজন।
ভোজন না কৈলা না কহিলা বচন ॥
শুনিয়াত দুই প্রভু পণ্ডিতের স্থানে।
ডাকিয়া কহিল কিছু শুন বিবরণে ॥
শুনিলাম দুই মূর্ত্তি করিয়াছ প্রকাশন।
সাক্ষাতে আনহ তারে করিব দর্শন ॥
আনিয়া বিগ্রহ দুই সম্মুখে রাখিল।
যেই মত দুই প্রভু তেমত দেখিল ॥

* * * * *

সেই প্রভু আমারে করিলা আত্মসাৎ।
এই দুই সেবা দিল মোর প্রাণনাথ ॥
কহিল সকল কথা শুন মন দিয়া।
এসব কহিল তোমার যোগ্যতা দেখিয়া॥" প্রেঃ বিঃ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা সুবল ঠাকুরই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। ইনি মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীকংসারি মিশ্র, মাতার নাম শ্রীকমলাদেবী। ইহাঁর অন্ত পাঁচ সহোদরের নাম,—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য। পূর্ব্ববাস শালিগ্রামে ছিল। পরে গৌরীদাস পণ্ডিত, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যদাস সরখেলকে বলিয়া তথা হইতে গঙ্গাতীরে অম্বিকা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। শ্রীগৌরীদাসের পত্নীর নাম শ্রীবিমলাদেবী। পণ্ডিত, শ্রীগৌর নিত্যানন্দের প্রেমে এমনই আত্মহারা, তাঁহাদের ক্ষণমাত্র অদর্শনেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে,—সমুৎকণ্ঠার দুর্ব্বিসহতাপে চিত্ত ব্যাকুল হয়। সর্ব্বান্তর্য্যামী প্রভু, পণ্ডিতের মনের

অভিপ্রায় অবগত হইয়া একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"পণ্ডিত ! তুমি যখন আমাদিগকে নিমেষার্দ্ধ না দেখিয়া এত ব্যথা পাও, তখন বলি শুন, তুমি নবদ্বীপ হইতে নিম্ববৃক্ষ আনাইয়া তাহাতে আমাদের দুইভাইয়ের দুইটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাও। নিত্যই আমাদের দেখিয়া সুখী হইবে।"

প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পণ্ডিত অচিরেই সেই শুভকার্য্য সম্পাদন করাইলেন। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের সেবানন্দে নিমগ্ন হইলেন। ইহারপর একদা শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া পণ্ডিতের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। করপুটে কহিলেন—"প্রভো ! আপনার আজ্ঞায় শ্রীবিগ্রহ যুগল প্রকাশ করিলাম, কিন্তু কই তাঁহারা ত আপনাদের মত ভোজন করেন না বা কথাবার্ত্তাও কহেন না ?

প্রভু হাসিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত ! তোমার সে বিগ্রহদ্বয় আমাদের কাছে আন দেখি !"

প্রভুর আজ্ঞামাত্র পণ্ডিত সেই অচল ব্রহ্মকে সচল ব্রহ্মের সম্মুখে আনিয়া স্থাপন করিলেন। দেখিলেন, চারি শ্রীমূর্ত্তিই একরূপ। কোন বৈলক্ষণ্য নাই। প্রভু পণ্ডিতকে রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। পণ্ডিত মনের মত ভোজনের আয়োজন করিয়া চারিখানি পাত্রে ভোগ সাজাইলেন। দুই প্রভু ও দুই শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে স্থাপন করিয়া ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলেন। চারি শ্রীমূর্ত্তিই ভোজন করিতে লাগিলেন। আহা ! ইহা এক অপূর্ব্ব রঙ্গ ! ইহা এক অননুভবনীয় গভীর প্রেমের খেলা। এই অপ্রাকৃত লীলারহস্য অবিশ্বাসীর তর্ক-প্রবণ শুষ্ক হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার না করিতে পারে কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের অনন্তমহিমা ও অসীম করুণায় বিশ্বাসী সেই

ভক্তগণ অবশ্যই এই ভক্ত-বাৎসল্যের কথা শুনিয়া প্রাণে অপার আনন্দ লাভ করিবেন।

অনন্তর প্রভু আচমন করিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন—"পণ্ডিত! তুমি যখনই অমাদের স্মরণ করিবে, তখনই আসিব। আর এই দুই বিগ্রহরূপে নিত্য তোমার ঘরে, সেবা গ্রহণ করিব।"

পণ্ডিত এই অপূর্ব্ব লীলারঙ্গ দর্শন করিয়া প্রেমানন্দের অকূল-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ধন্য অনুরাগ! ধন্য তোমার শক্তি! আজ তোমারই প্রভাবে শ্রীগৌরীদাসপণ্ডিত অচল ব্রহ্মকে সচল-ব্রহ্ম স্বরূপে অন্ন-ভোজন স্বীকার করাইলেন।

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য এইরূপে নিজ অভীষ্টদেবের মহিমা বর্ণন করিয়া কৃষ্ণদাসকে বলিলেন—"বৎস! তুমি উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই আমি তোমাকে আমার প্রভুর সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। আমার সেই পরমারাধ্য প্রভুপাদই এই দুই শ্রীবিগ্রহের সেবাভার আমাকে অর্পণ করিয়াছেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়-পার্ষদ গৌরীদাস পণ্ডিতের কাহিনী যেমন অলৌকিক আবার তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য এই শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের কাহিনীও সেইরূপ সুধা-মধুর ও ভক্ত-জন মনোহর। প্রসঙ্গতঃ তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্ত শ্রীগৌরীদাস ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীতে অতিশয় প্রীতি ছিল। গদাধর ও গৌরীদাস যেন একবৃন্তে দুটী ফুল। একদা প্রভাত সময়ে গৌরীদাস গদাধরের গৃহে গমন করিলেন। গদাধর প্রিয়-সুহৃদ্‌কে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং হাস্যমুখে বলিলেন—"আজ অতি শুভদিন, প্রভাতেই প্রিয় দর্শন ঘটিল।"

গৌরীদাস মৃদুহাস্যে প্রত্যুত্তর করিলেন—"নিজ মঙ্গল কামনা করিয়াই আসিয়াছি।"

গদা। আমার কি আছে, কি দিয়া তোমাকে তুষ্ট করিব ভাই!

গৌরী। তোমায় ভাবিতে হইবে না, আমিই মাগিয়া লইব।

গদা। এই সকলই তোমার। যাহা ইচ্ছা হয় লইবে তাহাতে আর বিচার কি?

গৌরী। আমি তোমার হৃদয়টী চাই।

গদাধর দ্বিরুক্তি না করিয়া গৌরীদাস-হস্তে হৃদয়কে সমর্পণ করিলেন। নয়নানন্দ ও হৃদয়ানন্দ গদাধরের দুই ভ্রাতষ্পুত্র। গদাধর হৃদয়কে অতিশয় স্নেহ করেন। বাল্যাবধি প্রতিপালন করিয়াছেন—শাস্ত্র-শিক্ষা দিয়াছেন। হৃদয় ও নয়ন ইহারাই সংসার-মায়ামুক্ত পণ্ডিতের সংসার। কিন্তু গৌরীদাস হৃদয়কে চাহিলেন, পণ্ডিত প্রসন্ন-মনে তাঁহার করে আপন হৃদয়কে অর্পণ করিলেন।——

"বাৎসল্যে বিহ্বল তবু মমতা না কৈলা।
পণ্ডিত ঠাকুরে দিয়া উল্লসিত হৈলা॥" ভঃ রঃ।

হৃদয়ানন্দ তদবধি অম্বিকাবাসী, হৃদয়ানন্দ তদবধি গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য।

"দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস মন্দিরে।
আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ সঙ্গে বিহরে॥"

গৌরীদাস-গৃহে গৌরনিতাই চিরবিরাজিত। একদা ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্বে গৌরীদাস হৃদয়ানন্দকে শুভ জন্মোৎসবের জন্য দ্রব্যাদির আয়োজনের ভার দিয়া স্বয়ং ভক্তগণের সহিত দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এদিকে উৎসবের আর দুই দিবসমাত্র বাকী, কাহাকেও নিমন্ত্রণাদি করা হয় নাই। কি করিবেন, বহু ভাবিয়া হৃদয়ানন্দ ভক্ত-গণের নিকট নিমন্ত্রণপত্রী প্রেরণ করিলেন। অনন্তর গৌরীদাস গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন শুনিলেন যে, হৃদয়ানন্দ উৎসবের সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন এবং তাঁহার নামে ভক্তগণের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র

পাঠাইয়াছেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তাঁহার এ ক্রোধ বস্তুতঃ আন্তরিক নহে, হৃদয়ের হৃদয় পরীক্ষার নিমিত্ত মাত্র। যথা——

"বাহে ক্রোধ করি করে তাড়ন ভৎর্সন।
মোর বিদ্যমানে কৈলা স্বতন্ত্রাচরণ॥
নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা যথাতথা।
যে কৈলা সে কৈলা এবে না রহিবে হেথা।" ভঃ রঃ।

গুরু আজ্ঞা সর্ব্বথা পালনীয়। হৃদয় গুরুর নিদারুণ আদেশে ব্যথিত হইলেন। নিজে অন্যায় করিয়াছেন, অপরাধী হইয়াছেন, তিনি আপনাকে ধিকার দিয়া গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। মনের ভাব,—গুরুদেব যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসিবেন, সে সময় তাঁহার চরণপদ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

এদিকে গৌরীদাস-গৃহে মহোৎসব আরম্ভ হইল। ভক্তগণের আনন্দ কোলাহলে গৌরীদাসের মন্দির মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু হৃদয়ের হৃদয় আজ বিষাদ-তিমিরে আবৃত, হৃদয় সে উৎসবানন্দে বঞ্চিত। ঐ দিবস একজন বণিক-শিষ্য বহু দ্রব্য লইয়া গঙ্গাঘাটে আসিলেন। তিনি হৃদয়ানন্দকে দেখিয়া বলিলেন যে, এই দ্রব্য সম্ভার উপস্থিত উৎসবের জন্য আনিত হইয়াছে। হৃদয় তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ গুরুদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু গৌরীদাস তাঁহার সংবাদে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া যেন ক্রোধভরে বলিয়া পাঠাইলেন—"কেন সে এ সংবাদ দিতেছে? সে-ই ঐ দ্রব্য লইয়া উৎসব করুক।"

সর্ব্বাবস্থায় গুরুবাক্য রক্ষণীয়। হৃদয়ানন্দ শ্রীগুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সেই বণিক-দত্ত দ্রব্যের দ্বারা গঙ্গাতীরেই উৎসব আরম্ভ করিলেন। অনেক বৈষ্ণবের সমাগম হইল। হৃদয়ানন্দ তাঁহাদের সহিত কীর্ত্তনে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নকালে দেবতার ভোগরাগের সময় গঙ্গাদাস নামক জনৈক

সেবককে গৌরীদাস শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করিতে বলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সিংহাসনে গৌর নাই—নিতাইও নাই; শূন্য সিংহাসন পড়িয়া রহিয়াছে। তবে গৌর নিতাই কোথায়? রহস্য বুঝিতে গৌরীদাসের অধিক সময় লাগিল না। মনে মনে আপন শিষ্যের মহিমা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইলেন। গৌরীদাস কাহাকেও কিছু না বলিয়া একটী যষ্টি হাতে লইলেন এবং বাহিরে ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে উৎসব ক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখেন যে, গৌর নিতাই, হৃদয়ানন্দের ভক্তির আকর্ষণে তাঁহারই উৎসব স্থলে উপস্থিত হইয়া অপূর্ব্ব-ভঙ্গীতে হৃদয়ানন্দের সহিত সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন। আরও দেখিলেন, তাঁহাকে যষ্টিহস্তে ক্রুদ্ধভাবে আসিতে দেখিয়া গৌর-নিতাই যেন ভীত চকিত হইয়া পড়িলেন; দেখিতে দেখিতে হৃদয়ানন্দের হৃদয়-কন্দরে লুক্কায়িত হইলেন।

ধন্য হৃদয়! ধন্য তোমার ভক্তিবল! আর গৌরীদাস, তোমার অদ্ভুত সখ্যভাবের মর্ম্ম মানব কি বুঝিবে?

পণ্ডিতের বাহ্যিক ক্রোধ আর কতক্ষণ থাকে? তিনি শক্তিধর বলিয়া এতক্ষণ সম্বরণ করিতে পারিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। হাতের যষ্টি ভূমিতে পড়িয়া গেল। নেত্রে প্রেমাশ্রুর প্রবাহ ছুটিল। তিনি ধন্য ধন্য বলিয়া হৃদয়কে স্নেহালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন—

"আজি হৈতে তোর নাম "হৃদয়চৈতন্য।"
চৈতন্য চান্দ তোমার হৃদয়ে, তুমি হৃদয়চৈতন্য॥"

হৃদয়চৈতন্য ঠাকুর সেই দিন হইতে শ্রীশ্রীগৌরনিতাই সেবার ভার প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার এই অপূর্ব্ব মহিমার কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। আর অমনই শত শত ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে আসিয়া শরণ লইল। তাই, কৃষ্ণদাস দর্শনের পূর্ব্বে কেবল তাঁহার নাম শ্রবণেই তাঁহার শ্রীচরণে দেহ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আবার শ্রীহৃদয়-চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য দুঃখী-কৃষ্ণদাসের গুরুভক্তিও এইরূপ অনুপমা। তাঁহার কাহিনীও এইরূপ অলৌকিকী ও ভক্তির অমিয় নির্ঝরিণী!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তীর্থ-পর্য্যটনে।

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের নিকট কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অবধি কৃষ্ণদাস কি-জানি-কি-এক নবজীবনলাভ করিলেন। নিরন্তর সেই মহামন্ত্র জপ করেন, দিবারাত্র কৃষ্ণনাম গান করেন, কোন কোন দিন নিদ্রার শান্তিময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া সারানিশি সেই মহামন্ত্র জপানন্দে বিভোর থাকেন। ভাবনিধি শ্রীভগবানের ভাব-তরঙ্গে এমনই আত্মহারা হইয়া থাকেন, দিবা ও রাত্রি কোথায় দিয়া চলিয়া যায় আদৌ তাহার উপলব্ধি হয় না—ক্ষুধা-তৃষ্ণাও ব্যাকুল করিতে পারে না। প্রেমানন্দের অনাবিল প্রবাহে হৃদয় কূলে কূলে ভরিয়া যায়—অশ্রুর পূতমন্দাকিনী সর্ব্বাঙ্গ ভাসাইয়া দেয়; কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয়ের অব্যক্ত অতৃপ্তির পূর্ণাহুতি হয় না—আকাঙ্ক্ষাও মিটে না। অনেক ভাবিয়া শেষে স্থির করিলেন, তিনি ভারতের তীর্থগুলিন দর্শন করিয়া ফিরিবেন। এইরূপ তীর্থপর্য্যটনও ত ভক্তির এক প্রধান সাধনাঙ্গ; সুতরাং এই সদাচার পালন করাও ভক্তমাত্রেরই কর্ত্তব্য। তাই, তীর্থ-পরিক্রমা করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণদাসের প্রাণ ক্রমেই আকুল হইয়া উঠিল। হয় তো, অনেকে মনে করিতে পারেন, যিনি সর্ব্ব-তীর্থোত্তম শ্রীগুরুর চরণান্তিকে বাস করিয়া নিত্য ভজনানন্দে কাল-

যাপন করিতেছেন, যাঁহার অন্তর বাহির ভাবময় শ্রীভগবানের মধুর-ভাবে বিভাবিত, তাঁহার আর তীর্থ-ভ্রমণের প্রয়োজন কি? তাদৃশ ভগবদ্ভক্তের পক্ষে তীর্থশ্রম তো মনের ভ্রান্তিমাত্র! আমরা বলি, তাদৃশ ভক্তেরও তীর্থ পর্য্যটনের প্রয়োজন আছে। পুণ্য-পবিত্রতাময় তীর্থধাম যখন পাপী-পাষণ্ডের অত্যাচারে ও তাহাদের কলুষভারে প্রপীড়িত হইয়া উঠে, তখনই এইরূপ সাধু মহাত্মার সেই তীর্থে গমন প্রয়োজন হইয়া উঠে। কারণ, ভক্তের দর্শনে, স্পর্শনে ও তাঁহার নির্ম্মল ভক্তি-প্রবাহে বহু পাপীর হৃদয়-কালিমা বিধৌত হইয়া যায়—অনেক পাষণ্ডী নবজীবন লাভে ধন্য হয়। ভক্তের হৃদয়-বিহারী শ্রীহরিই এইরূপ তীর্থের আবিলতা দূর করিয়া তীর্থকে নির্ম্মল ও সুপবিত্র করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণদাস তীর্থদর্শনে যাইবার জন্য বড়ই আগ্রহান্বিত হইলেন। কিন্তু হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরকে সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহসী হইলেন না। পাছে, গুরুদেব রুষ্ট হন এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা সঙ্কুচিত। একদিন ঠাকুর, কৃষ্ণদাসকে নিকটে ডাকিয়া স্নেহমধুরবাক্যে বলিলেন,—"বৎস! তোমাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-সঞ্চার হইয়াছে, দেখিতেছি—অতএব——

——"শুনহ উত্তর।
উৎকলে বৈষ্ণব কর সর্ব্ব ঘরেঘর॥
তোমার কৃপায় হবে তোমার সমান।
হেনজন উৎকলে হৈল সন্নিধান॥
তারে লয়ে সর্ব্বজীবে কর প্রেমদান।
চৈতন্যের আজ্ঞা হরেকৃষ্ণ বোল নাম॥
চৈতন্যের প্রেমভক্তি করহ প্রচার।
উৎকলের সর্ব্বজীবে করহ উদ্ধার॥" প্রেঃ বিঃ।

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস একটু লজ্জিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে

নয়নদ্বয় অশ্রুভারাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বলিবলি করিয়াও ভয়-প্রযুক্ত কিছু বলিতে পারিলেন না। ঠাকুর, কৃষ্ণদাসের সেই সঙ্কোচ-ভাব দেখিয়া বলিলেন—"বৎস! ভয় কি? নির্ভয়ে তোমার মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়া বল।"

কৃষ্ণদাস কৃতাঞ্জলিপুটে আবেগভরা কণ্ঠে কহিলেন——

"সর্ব্ব সত্য হয় প্রভু তোমার কৃপায়॥
মোরে কৃপা কর প্রভু সুবল-নন্দন।
মনে মোর সাধ আছে তীর্থ দরশন॥" রঃ মঃ।

ঠাকুর একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপু! তুমি কোন্ কোন্ তীর্থে যাইবার অভিলাষ করিয়াছ বল দেখি!"

কৃষ্ণদাস বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"যদি আজ্ঞা হয় যাই শ্রীবৃন্দাবন।"

ঠাকুর প্রীতিফুল্লমুখে বলিলেন—"ভাল, ভাল, শ্রীবৃন্দাবন তোমাকে অবিলম্বে কৃপা করুন।"

কৃষ্ণদাস শ্রীগুরুদেবের কৃপানুমতি পাইয়া আশায় ও আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া পরদিন প্রভাতেই শুভ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুর তাঁহার আশয় বুঝিয়া বিদায়-আশীর্ব্বাদ করিলেন। কৃষ্ণদাস শ্রীগুরুপাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া বহুক্ষণ কাঁদিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মধুর স্নেহপূর্ণ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া শ্রীগৌরনিতাইয়ের শ্রীমন্দিরে উপনীত হইলেন। প্রিয়শিষ্য কৃষ্ণদাসের জন্য প্রভুদ্বয়ের শ্রীচরণে প্রচুর করুণা-ভিক্ষা চাহিলেন। অনন্তর প্রসাদী বস্ত্র আনিয়া কৃষ্ণদাসের মস্তকে বান্ধিয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস পুলকিত দেহে পুনঃপুন প্রণাম করিয়া দীনবেশে পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সম্বল কেবল শ্রীভগবানের মধুমাখা নাম—আর শ্রীগুরুদেবের অভয় আশীর্ব্বাদ।——

"প্রাতে উঠি ঠাকুর তাঁরে করিলা বিদায়।
প্রণাম করিতে পদ দিলেন মাথায়॥
দুই প্রভু বসি আছেন আইলা ঠাকুর।
'কৃষ্ণদাস প্রতি কর করুণা প্রচুর॥"
আনিয়া প্রসাদী বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে।
প্রণাম করিয়া কান্দে যায় ধীরে ধীরে॥
মহাবিরক্ত কৃষ্ণনাম নিরন্তর গায়।
ভক্ষণের চেষ্টা নাহি পথে চলি যায়॥" প্রেঃ বিঃ।

কৃষ্ণদাস আনন্দে উৎসাহে দিনের পর দিন পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। নিরন্তর কৃষ্ণনামামৃত পানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, ক্লান্তি যেন একবারে ভুলিয়া গেলেন। কি এক ভাবের আবেশে আত্মহারা হইয়া দিবানিশি চলিতে লাগিলেন। ভিক্ষা মিলিল তো আহার হইল, নতুবা অনাহারেই দিন কাটিল, কোন কোন দিন বা কিঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণেই জীবন রক্ষা হইতে লাগিল। এইরূপে বহুদেশ অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণদাস প্রথমতঃ বক্রেশ্বর ও বৈদ্যনাথ তীর্থে গমন করিলেন। তথা হইতে গয়া কাশী ও প্রয়াগ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরায় উপনীত হইলেন।

"বক্রেশ্বর বৈদ্যনাথ প্রথমে চলিলা।
গয়া কাশী শিবস্থান সহরেতে গেলা॥
মহা প্রয়াগ গঙ্গা দক্ষিণে বাহিনী।
ত্বরিতে মথুরা গিয়া উত্তরে আপনি॥" রঃ মঃ।

দেখিলেন—নির্ম্মল-সলিলা উল্লাস-তরঙ্গা শ্রীযমুনা তর-তর-বেগে বহিয়া যাইতেছেন—তেমনই আনন্দের উচ্ছাসে শ্রীরাধাশ্যামের প্রেমের গাথা গাহিতে গাহিতে সেই অতীতের মধুর স্মৃতি জাগরিত করিয়া গর্ব্বভরে প্রবাহিত হইতেছেন। শ্রীযমুনা দর্শনে কৃষ্ণদাসের নয়নপ্রান্ত

হইতে প্রেমাশ্রু দরদরধারে বহিল। কৃষ্ণদাস ভক্তিগদগদকণ্ঠে শ্রীযমুনার স্তব পাঠ করিতে করিতে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। বিশ্রাম ঘাটে উপনীত হইয়া দেখিলেন—শ্যামা শ্রীযমুনার একতটে ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি মথুরার রাজভবন—অন্যতটে সেই চির আকাঙ্ক্ষিত অনন্ত-সুন্দরের মাধুর্য্য-লীলা-কানন—শ্যামশোভাময় শ্রীবৃন্দাবন। আহা! সেই আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য-সম্ভার দর্শন করিয়া কৃষ্ণদাস আনন্দে বিহ্বল হইলেন। আনন্দে যমুনা-বারি নাচিয়া নাচিয়া বহিতেছে—কৃষ্ণদাসের আনন্দ-স্রোতও ভাবের তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া হৃদয়ের কূলে কূলে ফুলিয়া উঠিতেছে। তিনি অনন্ত আবেগভরা-হৃদয়ে শ্রীগোবর্দ্ধনে গমন করিলেন। তথায় শ্রীরাধাশ্যামের মধুর লীলা-বিলাস স্মরণ করিয়া অনেক কাঁদিলেন—অনেক নতিস্তুতি করিলেন। অনন্তর শ্রীমদন-গোপাল ও শ্রীগোবিন্দজী দর্শন করিয়া মহানন্দে শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।——

"যমুনা বিশ্রাম স্থান দেখে গোবর্দ্ধন।
মদনগোপাল গোবিন্দ দেখে বৃন্দাবন॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমি দেখে সব দেবালয়।
গোকুল দ্বাদশ বন দেখিল সবায়॥
মহাবৈরাগ্যযুত সে কৃষ্ণ অশ্রুরঙ্গী।
সঙ্গে ভৃত্য সব তারা নাহি পায় লাগি॥" রঃ মঃ।

কৃষ্ণদাসের মহাবৈরাগ্য ও অগাধ কৃষ্ণভক্তি দর্শন করিয়া অনেক ভক্ত তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণদাস বহুলোক-সংঘট্টে থাকিতে ভালবাসিতেন না। বিশেষতঃ প্রাণের অধীরতায় তিনি কখন কোথায় থাকেন তাঁহার সঙ্গীগণ সহসা তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন না। এই সঙ্গীগণের মধ্যে কৃষ্ণদাসের অনুজ বলরামও আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। কিছুদিন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া মায়াময় সংসারের

প্রতি তাঁহারও বিরক্তি জন্মে। জ্যেষ্ঠভ্রাতার অন্বেষণ-উপলক্ষে তিনিও তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। যথা—

"কতদিন গৃহেতে রহিলা বলরাম।
শ্যামানন্দ অনুরাগে না ধরে পরাণ॥
শ্যামানন্দ অন্বেষণে তীর্থ-পর্য্যটনে।
কতদিনে বলরাম করিল গমনে॥" রঃ মঃ।

শ্রীবৃন্দাবনে কিছুদিন অবস্থান করিয়া কৃষ্ণদাস প্রাণের আবেগে আবার তথা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্রমশঃ—

"হস্তিনা পাণ্ডবপুরী দেখি হরষিতে।
দ্বারকা মিলিলা প্রভু বড়ই ত্বরিতে॥
রণছোড় রায় দেখি বড়ই আনন্দ।
দ্বারকা রহিলা কতদিন শ্যামানন্দ॥" রঃ মঃ।

দ্বারকায় কিছুদিন অবস্থানের পর কৃষ্ণদাস যেদিকে দুইচক্ষু চলে সেই পথেই চলিতে লাগিলেন। কঠিন বৈরাগ্য-প্রভাবে তাঁহার দেহাত্মজ্ঞান বিলুপ্ত,—শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, অনবরত পথ অতিক্রম করিতেছেন। দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় যেদিকে ইচ্ছা, সেইদিকেই যাইতেছেন। সঙ্গীগণও দেশে-দেশে তাঁহার অন্বেষণ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস এমনই দ্রুতপদে পথ-অতিক্রম করেন যে, সঙ্গীগণ দুই একদিনে, তবে তাঁহার উদ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।—

"তবে সিন্ধুপুরে কপিলের স্থানে গেলা।
মৎস্যতীর্থ শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী আইলা॥
কুরুক্ষেত্র পৃথূদক বিন্দু-সরোবর।
প্রভাস দর্শনে প্রভু চলেন সত্বর॥" রঃ মঃ।

দিবারাত্রি ভেদজ্ঞান-বিলুপ্ত। যেদিকে তীর্থের নাম শ্রবণ করেন, আনন্দে বিহ্বল হইয়া সেইদিকেই ছুটিয়া যান। কোনরূপ বিষাদ বা

বিরক্তির কণামাত্রও তাঁহাতে পরিলক্ষিত হয় না। সেই সদানন্দ হাস্য-প্রফুল্লভাব—সেই মধু-মিষ্ট কথা আর সর্ব্বোপরি সেই দীনভাব, দেখিলে—শুনিলে পাষণ্ডের নীরসপ্রাণও প্রীতিরসে সরস হইয়া উঠে। ভাবমুগ্ধ কৃষ্ণদাস এইরূপে স্বেচ্ছায় মনের সুখে ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন——

"ত্রিতকূপায়ন তীর্থ বিশালা আইলা।
ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থ প্রতিস্রোতা গেলা॥
প্রাচী সরস্বতী নৈমিষারণ্য দেখিয়া।
অযোধ্যা নগরে প্রভু উত্তরে আসিয়া॥
গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য সরযূ কৌশিকী।
পৌলস্ত্য-আশ্রমে গেলা গোমতী গণ্ডকী॥
ষোড়শ তীর্থেতে স্নান মহেন্দ্র পর্ব্বতে।
গঙ্গাজন্ম হরিদ্বারে আইলা ত্বরিতে॥
বদরিকাশ্রমে গেলা দেখি নারায়ণ।
আনন্দে গেলেন প্রভু ব্যাসের আশ্রম॥" রঃ মঃ।

সুধা-মধুর-কণ্ঠে কৃষ্ণনাম গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণদাস পথে চলিয়া যান, আনন্দ-স্ফূর্ত্তিতে নয়নে প্রেমাশ্রুর অমৃত-উৎস ঝরঝর বহিতে থাকে। তখন তাঁহার সেই ভাব-মাখা তনুখানি যাঁহার নয়নগোচর হয় বা তাঁহার মধুমাখা কৃষ্ণনাম গান যাঁহার শ্রুতিপথে প্রবেশ করে, সে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না,—তাহারই প্রাণমন ভগবদ্ভক্তির ভাবে আকর্ষিত হয়। অনন্তর——

"তথা হৈতে কতদিনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পম্পা ভাগিরথী প্রভু আইলা ত্বরিতে॥
পরেতে আইলা প্রভু সপ্ত গোদাবরী।
বেণুতীর্থে শ্রীপর্ব্বতে দ্রাবিড় নগরী॥

বেঙ্কটাদ্রিনাথে গেলা কামকোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চী হরিদ্বারায় দক্ষিণে মথুপুরী॥
কৃষ্ণমালা তাম্রপর্ণী যমুনা উত্তরিলা।
মলয় পর্ব্বতে অগস্ত্যের যজ্ঞশালা॥
বৈষ্ণের ভবনে গেলা কলিঙ্গা নগরে।
দক্ষিণ সাগরে গেলা শ্রীঅনন্তপুরে॥
ভ্রমি ভ্রমি পঞ্চ অপ্সরা সরোবরে।
মনের আনন্দে প্রভু করেন বিহারে॥
গোকর্ণাখ্য কুলানক ত্রিগর্ত্তক নাম।
দুর্ব্বেশন আর্য্যা নির্ব্বিন্ধ্যা পয়োষ্ণীধাম॥
যেবা মাহিষ্মতীপুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সুর্পারক প্রতিচিরি সেতুবন্ধে গেলা॥" রঃ মঃ।

কৃষ্ণদাস আনন্দ-মদিরায় বিহ্বল হইয়া ক্রমাগত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন; কিন্তু, শ্রান্তির পরিবর্ত্তে তাঁহার শরীরে যেন নিত্য নব-বলের সঞ্চার হইতেছে, কি এক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দে অন্তর বাহির ভরপুর হইয়া উঠিতেছে। এ তীর্থ অগ্রে দর্শন করিতে হইবে, পরে অন্যতীর্থ, এরূপ বিচার তাঁহার হৃদয়ে আদৌ উদয় হয় না। যেখানে পুণ্যস্থান আছে শুনিতেছেন, সেইদিকেই ধাবমান হইতেছেন।

"ধেনুতীর্থে গিয়া শুনে মায়াসীতা চুরি।
অবন্তী জীয়ড় নরসিংহ গোদাবরী॥
দেবপুরী ত্রিমল্ল কূর্ম্মনাথের পুরে।
এইমত তীর্থ দেখি দেখি সদা ফিরে॥
পরম আনন্দে প্রভু গেলা নীলাচলে॥" রঃ মঃ।

দূর হইতে শ্রীনীলাচলনাথের শ্রীমন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া দর্শন করিয়া কৃষ্ণদাস ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন। প্রেমে অঙ্গ অবশ,

চরণ যেন চলে না। প্রবল উৎকণ্ঠায় ছুটিয়া যাইতে চাহেন, পারেন না। কম্পিত হইয়া ধূলায় লুটিয়া লুটিয়া পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে সিংহ-দ্বারের নিকটে উপনীত হইয়া অরুণস্তম্ভের তলে দাঁড়াইলেন। পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্যফলে কৃষ্ণদাস আপনাকে নিতান্ত দীনহীন অপরাধী মনে করিয়া দূর হইতে সেই চির-বাঞ্ছিত শ্রীভদ্রাসহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মধুর মূর্ত্তি—সেই জগবন্ধুর জগমোহন রূপ অপলক-নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চিত, নয়নে অবিরাম অশ্রুধারা বিগলিত। স্তব করিতে গেলেন, পারিলেন না। নয়ন-মন সেই অখিল রসামৃত মূর্ত্তির মাধুর্য্য তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। ধবলাচলের পার্শ্বে বিদ্যুল্লতা-বিজড়িত নবনীরদ-ঘটা! আহা! আহা! সেই কালরূপে জগদালো-করা সৌন্দর্য্যছটা, কি সুন্দর! আ মরি! কি মনোলোভা! কৃষ্ণদাস সেই দারুব্রহ্মের শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়া গেলেন। সেই শান্ত-শীতল রূপ-মাধুর্য্যের কিরণ-কণা স্পর্শে তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ তাপ মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল। প্রারব্ধ কর্ম্মের পথে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ হইয়া গেল, তাঁহার আশা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি সম্পন্ন হইল।

কৃষ্ণদাস পূর্ণানন্দে কিছুদিন শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান করিয়া পরে তথা হইতে গঙ্গাসাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন—

"জগবন্ধু দেখি বড় আনন্দ উল্লাস।
চাঁদমুখ দেখিয়া পূরিলা অভিলাষ ॥
রাত্র দিন সর্ব্বস্থান আনন্দে দেখিয়া।
সর্ব্ব মোহন্তের সঙ্গে সম্ভাষা করিয়া ॥
কতদিন রহি গঙ্গাসাগরেতে গেলা।
তথা হৈতে আসি জন্মস্থান প্রবেশিলা ॥" রঃ মঃ।

কৃষ্ণদাস এইরূপে ভারতের বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া, বহু শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া, বহু সাধু-মহান্তের সহিত মধুর সম্ভাষা করিয়া, অনেক

পাপী-পাষণ্ডীর প্রাণে ভক্তির আনন্দবীজ নিহিত করিয়া অবশেষে জন্মভূমিতে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া জননী শ্রীদুরিকা ছুটিয়া গিয়া পুত্রের চাঁদমুখে শতচুম্বন দান করিলেন,— স্নেহাশ্রুধারায় তাঁহার হৃদয়দেশ ভাসিয়া গেল। হারান মাণিক 'দুঃখী'কে পাইয়া শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। কৃষ্ণদাস ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে সাশ্রু-নেত্রে পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুজনবর্গকে প্রণাম করিলেন, তাঁহাদের পদধূলি মস্তকে লইলেন। তাঁহারাও প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণদাস অপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলকেই যথাযোগ্য মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেন। বৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণমণ্ডলের দুঃখের সংসারে আবার সুখের ধারা উছলিয়া উঠিল— নিরানন্দের অমানিশার কোলে আবার আনন্দের পৌর্ণমাসী হাসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্রজবাস।

যে মধুকর একবার বিকসিত-কমল-নিষ্যন্দি মকরন্দের আস্বাদ পাইয়াছে অথবা তাহার সন্ধান জানিয়াছে, সে যেমন আর কেতকীর কণ্টকাকীর্ণ পরাগ-পরিমলে ভুলিয়া থাকে না; যে চাতক নবনীরদের উদয় দেখিয়াছে সে যেমন আর পিপাসিত-কণ্ঠে শুষ্ক-সরোবর-তীরে বসিয়া থাকিতে চায় না, সেইরূপ ভক্ত কৃষ্ণদাসের প্রাণ গৃহ-সুখে পরিতৃপ্ত না হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবানন্দে ডুবিয়া থাকিতে ব্যাকুল হইল—চিত্ত-চাতক শ্রীবৃন্দাবনের সেই নবঘনশ্যামের রূপ-মাধুর্য্য-ধারা

পানের নিমিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। যদিও গৃহবাসে তাঁহার ভজন-সাধনের কোন ব্যাঘাতই হইতেছে না, তথাপি তাহাতে যেন কত কারা-ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। পাছে সংসারের প্রলোভনে তাঁহার চিত্ত আসক্ত হইয়া পড়ে, এই চিন্তাতেই অস্থির। তিনি পিতা-মাতার স্থানে বিদায় লইয়া পুনরায় শ্রীপাট অম্বিকায় আসিলেন। বহুদিন পরে আবার প্রিয়শিষ্য কৃষ্ণদাসকে পাইয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য বড় আনন্দিত হইলেন। তাহার পর কৃষ্ণদাসের মনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ঠাকুর তাঁহাকে পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন যাইতে অনুমতি করিলেন।——

"শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি কিছুদিনে।
আজ্ঞা দিল শীঘ্র করি যাহ বৃন্দাবনে॥" ভঃ রঃ।

কৃষ্ণদাস গুরু-আজ্ঞা শুনিয়া কিছু ব্যাকুল হইলেন। করপুটে কহিলেন,—"প্রভো! নিরন্তর আপনার শ্রীচরণ-সেবা করি, এই আজ্ঞা করুন।"

ঠাকুর, কৃষ্ণদাসকে স্নেহালিঙ্গন-পাশে হৃদয়ে ধরিয়া কহিলেন—"যাও বৎস! আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে শীঘ্র গমন কর।"

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য কৃষ্ণদাসকে এরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে কেন শ্রীবৃন্দাবন পাঠাইতেছেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনবাসের উপযুক্ত পাত্র এবং ইহাই তাঁহার অন্তরের একান্ত বাসনা। আবার সে সময় শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট ভক্তি-গ্রন্থের আলোচনা করিতেছেন। ঠাকুর পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় পাই-য়াছেন। এই অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন শিষ্য কৃষ্ণদাসও যদি তাঁহাদের সহিত কোনরূপে মিলিত হইয়া ভক্তিগ্রন্থের আলোচনা করিয়া দক্ষিণ-দেশে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন; বোধ হয়, এই

উদ্দেশ্যেই ঠাকুর, কৃষ্ণদাসকে শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে অনুমতি করিলেন। ইহা ব্যতীত আরও কোন নিগূঢ় কারণ আছে কি না, ভক্ত পাঠকবর্গ তাহা ক্রমশঃ পাঠ করিয়া বুঝিবেন। অনন্তর——

"দুঃখী ক�ৃষ্ণদাস বহু ক্রন্দন করিয়া।
হইলা বিদায় প্রভু-পদে প্রণমিয়া॥
প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্যের দরশনে।
উথলিল প্রেম, অশ্রুধারা দু'নয়নে॥
করিয়া বিলাপ বহু ভূমে প্রণমিল।
প্রভু-পরিকর স্থানে বিদায় হইল॥
নবদ্বীপ আসি স্থান করিলা দর্শন।
সর্ব্বত্র মাগিলা প্রেম ভক্তি মহাধন॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল বলি করয়ে ফুৎকার।
মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার॥" ভঃ রঃ।

শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীগৌরভক্তের কৃপা ব্যতিরেকে ব্রজবাস সিদ্ধ হয় না। শ্রীগৌড়মণ্ডল চিন্তামণি স্বরূপ; সুতরাং তাঁহার কৃপা হইতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। তাই কৃষ্ণদাস পুনঃপুন শ্রীগৌড়মণ্ডল স্মরণ করিয়া দৈন্যভাবে কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই জন্যই শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন——

"গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥"

এইরূপ বহু মহান্তই শ্রীগৌড়ভূমির মহিমা গান করিয়াছেন। দুঃখী কৃষ্ণদাসও তাই শ্রীগৌড়মণ্ডলের ধ্যান করিতে করিতে পরম উৎকণ্ঠিত-চিত্তে শ্রীবৃন্দাবনের অভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে বহু তীর্থ

দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়া আগরা হইয়া মথুরায়—পরে তথা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন।——

“প্রভাত হইলে চলে বৃন্দাবন মুখে।
চলিতে না পারে অশ্রু বহি পড়ে বুকে॥
দেখিল গোবিন্দের চক্রবেড় দূর হৈতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হই পড়িলা ভূমেতে॥
গোবিন্দ দর্শন করি প্রেমে মত্ত হইয়া।
কান্দিয়া কান্দিয়া পড়ে প্রণাম করিয়া।” প্রেঃ বিঃ।

আনন্দময়ের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন, নিত্য আনন্দময়। কৃষ্ণদাস সেই আনন্দ-সমুদ্রে পড়িয়া একবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আনন্দে ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করিতেছে, আনন্দে কলকণ্ঠ বিহগাবলী সুস্বরে কুজন করিতেছে, আনন্দে শ্যামল বৃক্ষ-বল্লরী বুঝি বা শ্রীব্রজ-রজঃ পাইবার আশায় মস্তক চির-অবনত করিয়া আছে। আনন্দে মৃদু-সমীর ধীরে ধীরে বহিতেছে, আনন্দে কুসুম হাসিতেছে, আর আনন্দে ভ্রমরাবলী সেই হাসি-মুখ ফুলে ফুলে মৃদুগুঞ্জন করিয়া ফিরিতেছে, আনন্দে তপন-তনয়া যমুনা মৃদুলতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া বহিতেছে, আনন্দে ব্রজ-বালকগণ তাঁহাদের স্বভাব-সুলভ মধুর কণ্ঠে শ্রীরাধাশ্যামের লীলা-গাথা গাহিতেছেন। মরি! মরি! যেদিকে চাহিবে, সেই দিকেই আনন্দের অবাধ অনাবিল উৎস—সেইদিকেই সৌন্দর্য্যের ফুটন্ত মাধুরী। কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবন প্রথমবার যেরূপ দেখিয়াছিলেন এই দ্বিতীয়বারে তদপেক্ষা শত সহস্রগুণে আনন্দময় মনে করিতে লাগিলেন। আহা! ভক্তের নয়ন-মন যতই প্রেমে বিভাবিত হয় শ্রীবৃন্দাবন ততই নিত্য নূতন শোভাময় বোধ হইয়া থাকে। কৃষ্ণদাস ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনের বিশ্রাম ঘাট, ধীর-সমীর বংশীবট, যমুনাতট, চিরঘাট, আমলীতলা, প্রভৃতি লীলাস্থলগুলি প্রেমানন্দে দর্শন করিতে লাগিলেন;——

"কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমিয়া দেখেন সর্ব্বস্থান।
প্রেমে গদ্‌গদ্ অশ্রু বহে অবিশ্রাম॥
কবে কৃষ্ণ প্রাণপতি পাইব বলিয়া।
বৃন্দাবনে রাসস্থলে বুলে গড়ি দিয়া॥
বৈরাগ্যে আনন্দচিত্ত বিভোর অন্তরে।
সম্ভাষণ করেন সব কৃষ্ণ-সহচরে॥" রঃ মঃ।

অনন্তর কৃষ্ণদাস শ্রীগোবর্দ্ধনে উপনীত হইলেন। পরে তথা হইতে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড তীরে গমন করিলেন। শ্রীকুণ্ড-যুগল দর্শন করিয়া পরিক্রমা পূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সে সময় তাঁহার যে ভাবের উদয় হইল, তাহাতে তিনি একেবারে বিবশ হইয়া পড়িলেন।——

"গোবর্দ্ধন হৈতে অতি আনন্দ অন্তরে।
আইলেন রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড তীরে॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শোভা নিরখিয়া।
নেত্রজলে ভাসে মহা বিহ্বল হইয়া॥" ভঃ রঃ।

কৃষ্ণদাস এই যে দ্বিতীয়বার শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন, এই সময় শ্রীরূপসনাতনাদি পার্ষদ ভক্তগণ অপ্রকট হইয়াছেন, কেবল তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবগোস্বামী আছেন। এখন শ্রীবৃন্দাবন পূর্ব্বের ন্যায় শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় বনভূমি নয়। প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ, লোক-নাথ রূপ সনাতনাদি পার্ষদ্‌ভক্তগণে কৃপাশক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাদের দ্বারা জীবের মঙ্গলের জন্য এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনকে পূর্ণ শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন —লুপ্তপ্রায় ব্রজগরিমার পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছেন। এখন শ্রীবৃন্দাবনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শ্রীমন্দির—মন্দিরে মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ, কুঞ্জে কুঞ্জে প্রেমিক ভক্তগণের প্রাণের সম্মিলন। এখন শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি কুঞ্জ, নানা দিগ্দেশাগত ভক্তগণের লক্ষ লক্ষ কণ্ঠোত্থিত শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাগানে ও শ্রীরাধাশ্যামের লীলা কীর্ত্তনে নিরন্তর মুখরিত। শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটের

পর অনেক গৌরভক্ত প্রভুর বিরহ-তাপ প্রশমনের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। তখন শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণ বর্ত্তমান থাকিলেও বাহ্য জগতের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ তত বেশী ছিলনা। তাঁহারা দিবানিশি ভজনানন্দেই নিমগ্ন থাকিতেন। কৃষ্ণদাস যখন শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে প্রেমে বিহ্বল হইয়া লুটাইতে ছিলেন, সেই সময় দাস নামক জনৈক ব্রজবাসী তাঁহার এই ভাব দর্শনে বিমোহিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণদাস তাঁহাকে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামী শ্রীরাধাকুণ্ডেই বাস করেন। এই দাস-ব্রজবাসী তাঁহারই সেবক। 'দাস', কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে যখন প্রথমবার গমন করেন, তখন তিনি গোস্বামীদিগের সহিত তেমন বিশেষরূপ পরিচিত হন নাই। কেন হন নাই, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, অন্য তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল বলিয়াই তিনি বৃন্দাবনে সময়ক্ষেপ করেন নাই। যাহা হউক কৃষ্ণদাস কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—যষ্টির ন্যায় প্রায় চলৎশক্তিহীন এক বৃদ্ধ ধ্যানাস্তিমিত নয়নে বসিয়া আছেন। কাহারও সহিত কোন কথা নাই, কেবল চক্ষু দিয়া অবিরাম অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। বদনে বৈরাগ্যের ছটা ভাস্করতেজে স্ফুরিত হইতেছে। কৃষ্ণদাস তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিমোহিত হইলেন। বুঝিলেন ইনিই সেই বৈষ্ণব জগৎবিখ্যাত বৈরাগ্যের জীবন্ত-মূর্ত্তি শ্রীমদ্দাস গোস্বামী। কৃষ্ণদাস ভূমিতে পড়িয়া বারংবার প্রণাম করিলেন।——

"শ্যামানন্দ চেষ্টা দেখি দাস ব্রজবাসী।
জিজ্ঞাসিলা সকল পরমানন্দে ভাসি॥
শ্রীদাস গোস্বামীর নিকট লইয়া গেলা।
শ্যামানন্দ গমন বৃত্তান্ত জানাইলা॥

শ্যামানন্দ ভূমেতে পড়িয়া বার বার।
করয়ে প্রণাম নেত্রে বহে অশ্রুধার॥" ভঃ রঃ।

কৃষ্ণদাস এইরূপে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুটীরদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর শ্রীমৎ দাসগোস্বামীর কৃপা-দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত হইল। কহিলেন—"বাপু! কোথা হইতে আসিতেছ?"

কৃষ্ণদাস পুনরায় দণ্ডবৎ করিয়া নিবেদন করিলেন "প্রভো! দক্ষিণ দেশে আমার বাস। এক্ষণে আপনার শ্রীচরণ দর্শন অভিলাষেই এখানে আসিয়াছি।"

দাসগোস্বামী বালকের মধুর বাক্যে বড় প্রীত হইলেন। বলিলেন "—বৎস! তোমার নাম কি? তুমি কাহার চরণ আশ্রয় করিয়াছ?"

কৃষ্ণদাস বলিলেন—"প্রভো! অধমের নাম দুঃখী কৃষ্ণদাস। আমার প্রভুর নাম শ্রীপাদ্ হৃদয়চৈতন্য গোস্বামী; আর আমার পরমারাধ্য পরমগুরু, শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।

কৃষ্ণদাসের পরিচয় পাইয়া দাস গোস্বামী আনন্দে অধীর হইলেন। তিনি কৃষ্ণদাসকে স্নেহ পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।——

"বৈস বৈস ওহে বাপু দুঃখী কৃষ্ণদাস।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দের সুখের বিলাস॥
অধিকারীর কহ দেখি সকল মঙ্গল।" প্রেঃ বিঃ।

দাসগোস্বামী যেমন যেমন জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণদাস বিনীত-ভাবে তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। ইহাতে দাসগোস্বামী কৃষ্ণদাসের প্রতি অত্যন্ত কৃপা পরবশ হইয়া বলিলেন—"বাপু! কুঞ্জান্তরে কবিরাজ গোস্বামী আছেন তাঁহাকে দর্শন করিয়া আইস।"

কৃষ্ণদাস "যে আজ্ঞা" বলিয়া তখনই তাঁহার দর্শনার্থ গমন করিলেন। এই "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত"-রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, দাস

গোস্বামীর সহিত একত্র শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করেন। কৃষ্ণদাস তাঁহার কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—অতি বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ দেহ,—বাক্যও অতি সূক্ষ্ম। কৃষ্ণদাস কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবসর বুঝিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তদ্দৃষ্টে কবিরাজ গোস্বামী অতিশয় ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে বট, কে বট, বাপু কহ দেখি কথা।
এত দণ্ডবৎ করি কেন দাও ব্যথা॥" প্রেঃ বিঃ।

কৃষ্ণদাস সংক্ষেপে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমার নাম দুঃখী কৃষ্ণদাস। সম্প্রতি আপনার চরণদর্শন অভিলাষে এখানে আসিয়াছি।"

কবিরাজ "ভাল ভাল" বলিয়া ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন। বলিলেন—"বৎস! তোমার কোন্ দেশে বাড়ী? আমি চক্ষে ভাল দেখিতে পাই না, তোমায় চিনিতে পারিতেছি না। তোমার গুরুদেবের পরিচয় কি?

কৃষ্ণদাস করযোড়ে কহিলেন——

"দক্ষিণ দেশেতে জন্ম,—অম্বুয়া বলি গ্রাম।
হৃদয়চৈতন্যদাস মোর প্রভুর নাম॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরীদাস পণ্ডিত।
চৈতন্য নিত্যানন্দের সেবা হয় অখণ্ডিত॥" প্রেঃ বিঃ।

কৃষ্ণদাসের পরিচয় পাইয়া কবিরাজ সুখী হইলেন। স্নেহ পূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গে হস্তার্পণ করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কবিরাজের করুণা লাভ করিয়া কৃষ্ণদাস পুনরায় দাসগোস্বামীর কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। সে দিবস দাসগোস্বামী কৃষ্ণদাসকে আপনার কুঞ্জকুটীরে রাখিলেন। তৎপরদিন একজন লোক সঙ্গে দিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বৃন্দাবনে

শ্রীজীবই তখন ভক্তগণের আশ্রয়দাতা ও পালয়িতা। দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সনাতনকে স্বীয় কৃপালঙ্কারে ভূষিত করিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, তখন আদেশ করিয়াছিলেন যে, "সনাতন! বৃন্দাবনে যাও; যাইয়া তথায় ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন এবং লুপ্তব্রজের উদ্ধারসাধন কর। আর আমার যে সকল কাঙ্গাল ভক্ত বৃন্দাবনে গমন করিবে, তাহাদিগকে আশ্রয় দিও।" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কৃপানুজ্ঞা সনাতন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপগোস্বামী পালন করিতেছিলেন। তাঁহাদের অপ্রকটের পর, তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীও সেই আজ্ঞা পালন করিতেছেন। এজন্য কোন কাঙ্গাল বৈষ্ণব বৃন্দাবনে আগমন করিলে জীবগোস্বামীই তাঁহার আশ্রয়দাতা হন।

কৃষ্ণদাস শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীজীবের নিকট যাইতে যাইতে পথি-মধ্যে শ্রীমদনমোহন দর্শন করিলেন। দেখিয়াই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গী বৈষ্ণব কৌশলে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট লইয়া গেলেন এবং গোস্বামীকে কৃষ্ণদাসের সকল পরিচয় সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণদাস শ্রীজীবগোস্বামীকে দর্শন করিয়া আনন্দ-বিবশ হৃদয়ে তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন। যথা।——

"শ্যামানন্দ পড়িয়া গোস্বামী পদতলে।
আপনামানয়ে দীন ভাসে নেত্রজলে॥
শ্রীজীব গোস্বামী অতি বাৎসল্য স্নেহেতে।
আলিঙ্গন করি, অতি যত্ন করিলা বসিতে॥
জিজ্ঞাসিলা শ্রীগৌড় ভক্তের সমাচার।
জিজ্ঞাসয়ে দুই প্রভু সেবার প্রকার॥
শ্রীহৃদয় চৈতন্যের চেষ্টা জিজ্ঞাসিল।
ক্রমে ক্রমে শ্যামানন্দ সব নিবেদিল॥" ভঃ রঃ।

শ্রীজীব গোস্বামী, দুঃখী কৃষ্ণদাসের নিকট গৌড়ভক্তগণের সমাচার পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। শ্রীপাট অম্বিকায় শ্রীগৌর-নিতাইয়ের সেবার রীতি ও ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের ভক্তি-বার্ত্তা পুনঃপুন শ্রবণ করিতে লাগিলেন অনন্তর কৃষ্ণদাসের বৈষ্ণবোচিত বিরক্তভাব ও অসামান্য প্রতিভা দর্শন করিয়া মনেমনে স্থির করিলেন—বালক কিছুদিন আমার নিকট থাকিলে শেষে সুখী হইতে পারিবে। প্রকাশ্যে কহিলেন—"বাপু ! তুমি দেশে ফিরিয়া যাইবে, কি এইখানেই থাকিবে ?"

কৃষ্ণদাস বিনয়পূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন——

"আপনার কৃপা বিনা কে পারে রহিতে।
এইমত সাধ হয়, চাহিয়ে রহিতে॥" প্রেঃ বিঃ।

শ্রীজীব এই নবাগত বালকের দৈন্য-বিনয়ে অতীব প্রীত হইলেন। স্নেহ সহকারে কহিলেন—"বৎস !——

"এই কুঞ্জে রহ করিয়া আশ্রয়॥
যদি পড়িবার সাধ আছে তোমার মনে।
সর্ব্বশাস্ত্র পড়াই, পড় করিয়া যতনে॥
প্রসাদ পাইবে হেথা সাধন করিবা।
দুই এক টহল করি নিকটে পড়িবা॥" প্রেঃ বিঃ।

এইখানে প্রসাদ পাইবে আর এই কুঞ্জে থাকিয়া ভজন-সাধন করিবে। দুই একটি ভোগাদির পরিচর্য্যা করিতে হইবে মাত্র। তোমার ভক্তি গ্রন্থ পাঠে আগ্রহ দেখিতেছি,—অতএব শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত আমার নিকট ভক্তি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর।"

শ্রীজীবের কৃপা নিদেশ পাইয়া কৃষ্ণদাস কৃতজ্ঞচিত্তে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকটে থাকিয়া শ্রীনিবাস ও নরোত্তম নামক বঙ্গদেশীয় দুইজন অপুর্ব্ব বালক শ্রীরূপকৃত ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন

করিতেছিলেন। জ্ঞান, ভক্তি, শিষ্টাচার কি দৈন্য-ব্যবহার সর্ব্ববিষয়ে ইহাঁরা বালক হইলেও উচ্চ আদর্শ প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখিতেন। এমন কি তাঁহাদের ভক্তিমাখা প্রেমের মূর্ত্তি ও অদ্ভুত আচরণ দর্শন করিয়া কেহ কেহ তাঁহাদিগকে শ্রীগৌর-নিতাইয়ের দ্বিতীয় স্বরূপ বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীজীব দেখিলেন, সে হেন শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের পার্শ্বে এ নবাগত বালকটীও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপে দাঁড়াইবার উপযুক্ত। তাই, প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে——

"শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে।
মহাপ্রভুর প্রেমে জন্মি হইলা প্রবীণে॥
শ্রীমহাপ্রভুর শক্তি শ্রীনিবাস হয়।
নিত্যানন্দের শক্তি নরোত্তমেরে কহয়॥
অদ্বৈত প্রভুর শক্তি হয় শ্যামানন্দ।
যাঁর কৃপায় উৎকলিয়া পাইলা আনন্দ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর।
চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশাবতার॥"

আরও ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন——

"নিত্যানন্দ ছিলা-যেই, নরোত্তম হৈলা সেই,
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয়, শ্যামানন্দ তেঁহো হয়,
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ॥"

"সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব।
সর্ব্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তি-ভাব॥"

শ্রীনিবাস কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী চাখন্দি গ্রাম নিবাসী শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে আত্যন্তিকী ভক্তির কারণই গঙ্গাধর 'শ্রীচৈতন্য দাস' নামে অভিহিত।

চৈতন্যদাস সস্ত্রীক নীলাচলে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রভু মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন——

"পুত্রের কামনা করি আইলা ব্রাহ্মণ।
শ্রীনিবাস নামে তার হইবে নন্দন॥
শ্রীরূপাদি দ্বারা ভক্তি-শাস্ত্র প্রকাশিব।
শ্রীনিবাস দ্বারা গ্রন্থ-রত্ন বিতরিব॥
মোর শুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস।
তারে দেখি সর্ব্বচিত্তে বাড়িবে উল্লাস॥" ভঃ রঃ।

এই অপূর্ব্ব কৃপাশক্তির ফলে শ্রীচৈতন্য দাস শ্রীনিবাসকে লাভ করেন। শ্রীনিবাস, প্রভুত্রয়ের অপ্রকটে তাঁহাদের প্রেম-বিরহে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া অতি অল্পবয়সেই বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। শ্রীনীলাচল শ্রীনবদ্বীপ প্রভৃতি প্রভুর লীলাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীচরণে আত্ম সমর্পণ করেন। তদবধি শ্রীনিবাস শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন।

শ্রীনিবাসের পর শ্রীনরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করেন। নরোত্তম, পদ্মা-নদীর অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তি খেতরি' গোপাল-পুরের অধিপতি রাজা শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র। ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। তাঁহার মাতার নাম নারায়ণী। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ যখন প্রথমবার শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন তখন তিনি সহসা রামকেলি গ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া খেতরীর নিকট উপস্থিত হন। সেই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অভিপ্রায় বুঝিয়া পদ্মাবতী গর্ভে ভাবী নরোত্তমের জন্য 'প্রেম-ধন' স্থাপিত রাখিয়াছিলেন। যথা সময়ে রাজকুমার নরোত্তম সেই প্রেম লাভ করিয়া, সেই গোলোক-ভাণ্ডারের গুপ্তনিধি প্রাপ্ত হইয়া

প্রেম-রত্নাকরকে পাইবার নিমিত্ত একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তাহার পর একদিন তিনি রাজভোগ—সেই সুখের বিলাস-পর্য্যঙ্ক অবহেলে শূকর-বিষ্ঠাবৎ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। তথায় শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর চরণে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত সেবা দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং সেই অবধি শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া শ্রীনিবাসের সহিত একত্র শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেছেন।

শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তমের নাম শুনিবা মাত্র কৃষ্ণদাসের হৃদয় কি-জানি কেন নাচিয়া উঠিল। বুঝি বা তাঁহারা কত জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত প্রাণের বন্ধু, তাই তাঁহাদের নাম শ্রবণমাত্র প্রাণ এমন ভাবে শ্রদ্ধায় গলিয়া প্রণয়ে মিশিয়া তাঁহাদের প্রাণের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইল! তাঁহাদের দর্শন করিবার পূর্ব্বেই কেবল নাম শ্রবণেই তাঁহাদিগকে আপনার প্রাণের সুহৃদ্ জ্ঞানে প্রাণে প্রাণে ভাল-বাসিয়া উল্লসিত হইলেন—

"শ্রীনিবাস নরোত্তম নাম শ্রবণেতে।
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ উল্লাস মনেতে॥" ভঃ রঃ।

কৃষ্ণদাস আর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"প্রভো! আজ্ঞা করুন, তাঁহারা কোথায় আছেন, আমি দর্শন করিয়া আসি।"

কৃষ্ণদাসের আগ্রহ দেখিয়া শ্রীজীব তাঁহাদের কুঞ্জ কোথায় বলিয়া দিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে ঠিক সেই সময়েই তথায় শ্রীনিবাস ও নরোত্তম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীব তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদাসের পরিচয় দিয়া বলিলেন—

"দুঃখী কৃষ্ণদাস এই আইলা গৌড় হৈতে॥
হৃদয়-চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য হন।

কহিতে কি তাঁর অলৌকিক গুণগণ ॥
তাঁ সভার মঙ্গল সংবাদ শুনাইলা।
এই কথোক্ষণ রাধাকুণ্ড হৈতে আইলা ॥
তোমা দোঁহা দেখিতে উদ্বিগ্ন অতিশয়।
এত কহি শ্যামানন্দে দিল পরিচয় ॥" ভঃ রঃ।

ভাব বিহ্বল কৃষ্ণদাস অতৃপ্ত নয়নে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ভক্তিভরে ভূমিতে লুটাইয়া উভয়কে প্রণাম করিলেন।——

"শ্যামানন্দ ভূমিতলে পড়ি প্রণমিতে।
শ্রীনিবাস কোলে লৈয়া না পারে ছাড়িতে ॥
নরোত্তমে প্রণমিতে তেঁহো প্রণমিয়া।
আলিঙ্গন কৈল অতি স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥"

তিনটী ভক্তি বিগলিত-প্রাণ এইরূপে মিলিয়া মিশিয়া যেন এক হইয়া গেল—একই প্রেম-সূত্রে তিনটী হৃদয় গাঁথা পড়িল।—যেন একই বৃক্ষে তিনটী কুসুম-কোরক বিকসিত হইয়া উঠিল। আহা! কি অপূর্ব্ব মিলন! ভক্ত-হৃদয়ের কি অপূর্ব্ব জীবন্ত দৃশ্য! ইহা যেন সেই জাহ্নবী-যমুনা-সরস্বতীর পবিত্র ত্রিবেণী-সঙ্গম! শ্রীজীব এ দৃশ্য দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। এইরূপে কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনে দুই প্রিয় সুহৃদ্ লাভ করিয়া পরমানন্দে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। পরস্পরের প্রতি প্রীতি এমনই গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল যে তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।——

"শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে।
যে অদ্ভুত প্রীতি তা কহিতে কেবা জানে ॥" ভঃ রঃ।

আজকাল যে বয়সে লোক বিলাস-ব্যসনের আবিল-স্রোতে জীবন-তরিকে ভাসাইয়া দিয়া দুঃখ দুর্ভোগের গভীর আবর্ত্তে পতিত হয়,

কামিনী-কাঞ্চনের কুহক-মদিরায় উন্মাদিত হইয়া সংসারে দিবা-নিশি ছুটাছুটি করে, কৃষ্ণদাস সেই বয়সে কৃষ্ণ-প্রেমের কাঙ্গাল হইয়া কাতর প্রাণে বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কখন ভক্তি-গ্রন্থ পাঠ করেন কখন বা সাধন-ভজনে নিবিষ্ট থাকেন।

শ্রীজীব ভাল দিন দেখিয়া কৃষ্ণদাসকে ভক্তি-গ্রন্থ পাঠে ব্রতী করিলেন। কৃষ্ণদাস দিবাভাগে দুই একটী ঠাকুর ভোগের টহল করেন। তদ্ভিন্ন সকল সময়েই অদম্য অধ্যবসায় ও আগ্রহ সহকারে ভক্তি-গ্রন্থ শ্রবণ পঠন করেন। আর রাত্রিতে কুঞ্জান্তরে বসিয়া তন্ময় ভাবে ইষ্ট সাধনায় আবিষ্ট থাকেন। এইরূপে অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি এক অমানুষী প্রতিভা-বলে সকল শাস্ত্রে শ্রীজীবের ন্যায় অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন।——

"বিদ্যার আরম্ভ কৈল করিয়া সুদিন।
পড়িতে পড়িতে অতি হইলা প্রবীণ॥
রাত্রে বসি সাধন করে এক কুঞ্জান্তরে।
কভু ভক্তি-গ্রন্থ শুনে আনন্দ অন্তরে॥
ব্যাকরণ সাঙ্গ হৈল কাব্য কিছু দেখে।
কখন বসিয়া ভক্তি-গ্রন্থ কিছু লেখে॥
পড়িতেই ব্যুৎপন্ন হইল অতিশয়।
ভক্তি-গ্রন্থ পড়িতে গোসাঞির আজ্ঞা হয়॥
ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু আমূল হইতে।
আনন্দিত হৈল চিত্ত পড়িতে পড়িতে॥
সিদ্ধান্ত বৈধীরাগ-তত্ত্ব দেখিতে শুনিতে॥
পূর্ব্বপক্ষ করেন গোসাঞি সুখ পান চিতে॥
তাঁর স্থানে উজ্জ্বল পড়ে টীকার সহিতে।
সর্ব্বত্র যোগ্যতা হৈল কহিতে শুনিতে॥" প্রেঃ বিঃ।

আরও "ভক্তি রত্নাকরে" লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীজীব গোসাঞি অতি প্রসন্ন হইলা।
শ্যামানন্দে ভক্তি-গ্রন্থারাম্ভ করাইলা॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যে শ্যামানন্দ সমর্পিলা।
কতদিনে শ্যামানন্দ অধ্যাপক হৈলা॥"

কৃষ্ণদাসের অদ্ভুত ভক্তি চেষ্টা, বৈষ্ণবোচিত সদাচার সদ্ব্যবহার ও মধু মিষ্ট কথায় বৃন্দাবন-বাসী মাত্রেই তাঁহাকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আর শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়-জন বোধে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-মমতা দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাসও অকৃতজ্ঞ নহেন, তিনিও প্রাণভরা প্রীতি-শ্রদ্ধা ঢালিয়া তাহার প্রতিদান করিতে লাগিলেন।

তখন সাধারণ ডাক বিভাগ ছিলনা। সুতরাং মধ্যে মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন হইতে কোন বৈষ্ণব গৌড়দেশে আগমন করিলে কৃষ্ণদাস তাঁহার হস্তে পত্রী দিয়া ঠাকুর হৃদয় চৈতন্যকে সমাচার জ্ঞাপন করিতেন। যথা—

"শ্যামানন্দের ভক্তি-রীত চমৎকার।
মধ্যে মধ্যে অম্বিকা পাঠান সমাচার॥" ভঃ রঃ।

ঠাকুরও সেই বৈষ্ণবের নিকট কৃষ্ণদাসের চমৎকার ভক্তি-রীতি ও চারু-চরিত্র অবগত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহার প্রত্যুত্তরে সেইরূপ শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রী কোন বৈষ্ণবের দ্বারা শ্রীজীব গোস্বামীকে ও শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণদাসকে কৃপা-পত্রী প্রেরণ করিতেন।—

"বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ যে যে কার্য্য করে।
সে কেবল শ্রীগুরুদেবাজ্ঞা অনুসারে॥
শ্রীশ্যামানন্দের চারু-চরিত্র শুনিয়া।

হেথা শ্রীহৃদয়-চৈতন্যের হর্ষ হিয়া।

শ্রীজীব গোস্বামীরে লেখেন পত্রী দ্বারে।
দুঃখী কৃষ্ণদাস শিষ্যে সঁপিনু তোমারে॥
ইহার যে মনোভীষ্ট পূরিবে সর্ব্বথা।
কতদিন পরে পুনঃ পাঠাইবে হেথা॥
শ্যামানন্দে কহিয়া পাঠান নিরন্তর।
শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সোসর॥
সাবধান হবে ভক্তি-রত্ন উপার্জ্জনে।
অপরাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে॥
এইরূপ শিষ্যে সদা করে সাবধান।
গুরু-অনুগ্রহে শ্যামানন্দ ভাগ্যবান্॥" ভঃ রঃ॥

আহা! কৃষ্ণদাস বাস্তবিকই মহাভাগ্যবান্। জন্ম-জন্মার্জ্জিত পুণ্য-পুঞ্জ-প্রভাবে যেমন অসামান্য শক্তি-সম্পন্ন দীক্ষাগুরু লাভ করিয়াছেন, শিক্ষাচার্য্যও তাদৃশ শক্তি-শালী। আবার প্রাণের বন্ধু দুইটীও সেইরূপ অপূর্ব্ব! জীবের ভাগ্যে এরূপ সৎসঙ্গ প্রকৃতই দুর্লভ। এ মিলন চিন্ময় জগতের এক মহা আকর্ষণ বা মহানন্দময় ব্যাপার! কৃষ্ণদাস এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ-কথা রস-প্রসঙ্গে ও কৃষ্ণ-ভজন রঙ্গে পরমানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ।

ভক্তি-বিগলিত-প্রাণ দুঃখী কৃষ্ণদাস যেরূপে 'শ্যামানন্দ' নাম প্রাপ্ত হন সে কাহিনী অতি সুধাময়ী, অতি অলৌকিক। শ্রীরাধা-মাধবের সুধা মধুর লীলা বিলাস-তত্ত্ব শ্রীগ্রন্থ সমূহে পাঠ করিতে করিতে এবং প্রেমিক ভক্তগণের মুখে সে প্রাণস্পর্শিনী কথা শুনিতে শুনিতে কৃষ্ণদাসের প্রাণ-মন প্রেমে গলিয়া সেই প্রেমময়-প্রেমময়ীর প্রেম-মাধুর্য্যের অনন্ত-সমুদ্রে মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইল—সেই সরস লোভ-প্রসূত অনুরাগ-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। তিনি একদিন শ্রীজীব গোস্বামীকে প্রাণের আবেগে কহিলেন—"প্রভো! শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিভৃত নিকুঞ্জ-সেবাময় মধুর ভজন-রীতি কিরূপ? কোন্ ভাবে কিরূপ চেষ্টা করিলে সে সাধ্যসার সেবা-দাস্য পাওয়া যায়, তাহা কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়?"

এই কথা শুনিয়া শ্রীজীব বড় আনন্দিত হইলেন এবং কৃষ্ণদাসকে উপযুক্ত পাত্র জানিয়া বিস্তারিত ভাবে সেই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিলেন।——

"তবে গোসাঞি পঞ্চরসের কহিল আখ্যান।
বিশেষ মধুর রস তাহাতে শুনান॥
এই ভাব এই ভাবাশ্রয় রাগ অভিমত।
নিষ্কপটে কহেন তাঁরে যেই অনুগত॥"

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসের অধিকার, সেবা ও ভাব পরিপাট্যের বিষয় শ্রীজীব অকপটে বিবৃত করিলেন।

তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর বিলাস-রহস্য এবং প্রেম-প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি সখীগণের নিকুঞ্জ-সেবার বিষয় অবগত হইয়া সেই ভাব ও সেই সেবানন্দ লাভের জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। বুঝিতে পারিলেন —এই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ মধুর সেবা সাধনাই, সাধন ব্যাপারের চরমাবধি, ইহাতেই জীবনের পরম সুখ ও চরমাতৃপ্তি!——

"রাধাকৃষ্ণ রাস-লীলা শুনে রাত্রি দিনে।
সেই সে মধুর বস্তু করে আস্বাদনে॥
মধুরে বাড়িল লোভ অন্য চেষ্টা নাই।
কুঞ্জ-সেবা করি রহে শ্যামানন্দ গোসাঞি॥
শ্রীবৃন্দাবনের কনক-কুঞ্জের সন্নিধানে।
নিত্য ঝাঁট দেন সেবা করেন বিহানে॥" শ্যাঃ প্রঃ (১)

---

(১) "শ্যামানন্দ প্রকাশ" একখানি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রেম-বিলাস বা ভক্তিরত্নাকরে শ্যামানন্দের সিদ্ধাবস্থার যে সুধামাখা বার্ত্তা ইঙ্গিতাভাসে বর্ণিত আছে "শ্যামানন্দ প্রকাশে" তাহা বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রীরাধামাধব দাসের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস বিরচিত। গ্রন্থকার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ——

"শ্রীরাধা-মোহন দাস ঠাকুর হামারি।
তাঁর দুই পাদ-পদ্ম মস্তকেতে ধরি॥
বন্দিব শ্রীনয়নানন্দ দেবের চরণ।
পরমেষ্ঠ গুরু তেঁহো বন্দ অনুক্ষণ॥
বন্দিব শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবের চরণ।
পরমেষ্ট পরাৎপর গুরু তেঁহো হন॥
বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
জন্ম জন্ম হও তাঁর উচ্ছিষ্টের কুকুর॥"

ব্রজ-সখীদের সেবা-মাধুর্য্যের প্রবলতর লোভে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষ্ণ দাস বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে শ্রীরাধামাধবের মধুর লীলারাজ্যে প্রবেশ লাভ ঘটিবে, দিবানিশি এই চিন্তাতেই প্রাণ অস্থির। কৃষ্ণদাস, শ্রীসুবল সখা—গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্যানুশিষ্য; সুতরাং সখ্য-রসাশ্রিত। কিন্তু সখী-ভাবাশ্রয় ব্যতীত শ্রীরাধাশ্যামের কুঞ্জসেবা-সাধ্য-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবে সে মনোহর সেবা-রঙ্গ স্ফুরিত হয় না। তাই, কৃষ্ণদাস শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট সখীভাব অঙ্গীকার করিয়া কুঞ্জসেবার অধিকার লাভোপযোগী সাধন ভজন শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ অনুরাগী হইলেন। তিনি একদিন শ্রীজীব গোস্বামীকে দীনভাবে বলিলেন—"প্রভো! কৃপা করিয়া যাহা উপদেশ দান করিলেন, এইবার তাহা অঙ্গীকার করুন। এক্ষণে বুঝিয়াছি, শ্রীরূপের যে অভিমত সেই মতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাহাই আশ্রয়-নীয়। তাঁহার শ্রীগ্রন্থ আস্বাদনে এবং আপনার দর্শনে সেই ভাবগ্রহণের একান্ত স্পৃহা জন্মিয়াছে। ভয়-প্রযুক্ত এতদিন কিছু বলিতে পারি নাই; কিন্তু এখন আর না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। প্রভো! কৃপা করিয়া এক্ষণে আমাকে সেই ভাব-ভূষণে ভূষিত করুন।—

"আপনার দর্শনে আর গ্রন্থ আস্বাদনে।
ভয়ে নাহি কহি লোভ হইয়াছে মনে॥
তুমি কৃপাময় মোরে' কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার প্রসাদে জানিনু এইভাব-সার॥" প্রেঃ বিঃ।

শ্রীজীব, কৃষ্ণদাসকে যোগ্যপাত্র জানিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

গ্রন্থকার স্বপ্নাবেশে শ্যামানন্দ প্রভুর কৃপাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ দেখিতে গেলে গ্রন্থখানি শ্যামানন্দ-বিষয়ে "ভক্তি-রত্নাকর" বা "প্রেম-বিলাসের" পরিশিষ্ট মাত্র।

আনন্দ, উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতায় কৃষ্ণদাসের হৃদয় ভরিয়া গেল—এক অজ্ঞাত নবশক্তি সঞ্চারে তাঁহার প্রাণ-মন নাচিয়া উঠিল।

"অঙ্গীকার কৈল গোসাঞি হৈল সফল।
শুনিতেই সিংহ প্রায় হৈল তাঁর বল॥" প্রেঃ বিঃ।

ইহারই পর একদিন অতি প্রত্যূষে ব্যাকুল-প্রাণ কৃষ্ণদাস ভাব-বিভোর হইয়া কনক-কুঞ্জে 'ঝাড়ু' দিতেছেন। সহসা সে মধুময় ভাব-তরঙ্গে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। তিনি সেই কুঞ্জ-প্রাঙ্গনে প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন। বাহ্যচেষ্টা তিরোহিত, দেহে প্রাণ আছে কি না তাহাই সন্দেহ। আহা! তাঁহার চির-পিপাসিত আত্মা বুঝি বা এইরূপে গুণময় দেহ হইতে সিদ্ধগোপী দেহে প্রেমময়ের অপ্রাকৃত প্রেমের রাজ্যে বিচরণ করিতে চলিয়া গেলেন! ধন্য কৃষ্ণদাস!

এদিকে বেলা যত বাড়িতে লাগিল, শ্রীজীব গোস্বামী কৃষ্ণদাসকে দেখিতে না পাইয়া ততই চিন্তিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণদাসের অন্বেষণে বাহির হইলেন। দেখিলেন—কৃষ্ণদাস কুঞ্জ-চত্বরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন। শ্রীজীব সেই অদ্ভূত প্রেমাবেশ দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে কোলে তুলিয়া কুটীরে লইয়া আসিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় কৃষ্ণদাসের বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি তখন শ্রীজীবের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন——

"অচেতন হৈয়া কুঞ্জে পড়িয়া রহিলা॥
দেহে প্রাণ নাহি কিছু নাহি বহে শ্বাস।
দেখিয়া শ্রীজীব চাঁদে লাগিল তরাস॥
শ্যামানন্দের রাগ দেখি শ্রীজীব সত্বরে।
কোলে করি লৈয়া গেলা আপন কুটীরে॥

তৃতীয় প্রহর বেলা চেতনা হইলা।
দেখিয়া শ্রীজীব চাঁদের চরণে পড়িলা॥ শ্যাঃ প্রঃ।

শ্রীজীব স্নেহ-মধুর বাক্যে কৃষ্ণদাসকে শান্ত করিলেন। কৃষ্ণদাস স্নান আহ্নিক কৃত্য সমাপন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিলেন। এই ঘটনার দুই চারিদিন পরে শ্রীজীব, কৃষ্ণদাসকে নিকটে বসাইয়া রাগানুগা ভজনের উপদেশ প্রদান করিলেন।——

"দুই চারিদিন অন্তে নিকটে বসাইল।
রাধিকাজিউর মন্ত্র ষড়ক্ষর দিল॥
কৃষ্ণপঞ্চ নাম রাধিকার পঞ্চ নাম।
যেই কালে জপিবার কহিল বিধান॥
কামবীজ কহিল তবে বিশেষ প্রকার।
রাধাকৃষ্ণ লীলায় যুক্ত তখন জপিবার॥
সখীভাব গ্রহণ কৈল নিজ অনুগত।
সেবা কাল যার যেই সাধন অভিমত॥
এই যে শুনিলে তার কহি মর্ম্ম কথা।
পশ্চাতে শুনিবে যেই আছয়ে সর্ব্বথা॥" প্রেঃ বিঃ।

শ্রীজীব এইরূপে কৃষ্ণদাসকে মানস সেবার অধিকারী করিলেন। শ্রীরূপের অভিপ্রেত নিজানুগত সমুদায় সাধন-ক্রমই শিখাইলেন। রাগানুগা মার্গে কামানুগা অঙ্গই কুঞ্জসেবা প্রাপ্তির সাধন এবং বিশুদ্ধ স্মরণ মননই সেই সাধনার মুখ্য অঙ্গ। আমাদের এই গুণময় দেহ অর্থাৎ স্থূল জড়ীয় দেহ দ্বারা সেই রসিক-শেখরের সাক্ষাৎ সেবা সিদ্ধ হয় না। যে স্থানের কথা, সেই স্থানের অনুরূপ রসময়-দেহ হওয়া চাই। সুতরাং আনন্দ-চিন্ময়-রসভাবিতা সখীর সঙ্গিনী হইতে হইলে সাধককে ধ্যান দ্বারা নিজেকে তদ্রূপ পরিভাবিত করিয়া অভীষ্ট সখীর অনুগা হইয়া কুঞ্জ-সেবার অধিকার লাভ করিতে হয়। অভীষ্ট প্রিয়-

জনকে সর্ব্বদা স্মৃতি-পথে বিরাজমান রাখিয়া ব্রজবাস করা আবশ্যক। সাক্ষাৎ ভাবে না পারিলে মনের দ্বারাও ব্রজবাস পরিচিন্তন কর্ত্তব্য এবং শ্রীরাধাশ্যাম যে সময়ে যে লীলা-বিলাস করেন, শ্রীললিতা ও শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখীর অনুগা হইয়া ও তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মানসে তৎসময়োপযোগী সেবা নির্ব্বাহ করা এবং তাঁহাদের লীলা-চরিত্রাদি স্মরণ-মনন-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আবিষ্ট থাকাই রাগানুগা ভক্তির কামানুগা সাধন প্রণালী।

কৃষ্ণদাস শ্রীজীবের কৃপায় তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণদাস ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের নিকট সখ্য-কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আবার শ্রীজীবের নিকট ষড়ক্ষর শ্রীরাধামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ইহাতে কৃষ্ণদাসের অপরাধ হইল না কি? শ্রীজীবের পক্ষেও কি এ কার্য্য দূষনীয় নহে?—যদি দোষাবহ হইত, তাহা হইলে বৈষ্ণব-পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীজীব গোস্বামী কখনই এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীহৃদয়চৈতন্যপ্রভু কৃষ্ণদাসের সর্ব্বপ্রকার মনোভীষ্ট পূর্ণ করিতে শ্রীজীবকে আজ্ঞাপত্রী প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণদাসকেও বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"কৃষ্ণদাস! তুমি শ্রীজীবকে আমার সদৃশ জানিও।" শ্রীগুরুর এইরূপ কৃপা-আজ্ঞা পাইয়াই কৃষ্ণদাস, প্রেমভক্তির উচ্চতম সেবা লাভের জন্য শ্রীজীবের আনুগত্য স্বীকার করিলেন। সাধক উজ্জ্বল-রসতত্ত্ব-পিপাসু হইয়া সাধনের উচ্চতম সোপানে যেমন অগ্রসর হইতে থাকেন, অমনই তাঁহাকে স্বাভীষ্ট সাধনের অনুকূল পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়। সুতরাং তাঁহার আর পূর্ব্ব-প্রণালী বজায় রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ অন্য যে কোন ভাবাশ্রিত সাধক মধুর ভাবের আনন্দলীলায় প্রবেশ-প্রয়াসী হইলে, তিনি অবশ্যই শ্রীযুগলমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান কালে বাৎসল্য-রসাশ্রিত শ্রীবল্লভভট্টকে

শ্রীবালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষা সত্ত্বেও শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট পুনরায় শ্রীশ্রীকিশোর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত করাইয়াছিলেন। আবার——

দীক্ষা শিক্ষাগুরুশ্চৈব চৈকাত্মা চৈক দেহিনঃ।

অর্থাৎ দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু একই আত্মা একই দেহ। এই গুরুদ্বয় সম্বন্ধে ভক্তির কোন তারতম্য নাই। উভয়েই তুল্যরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। তবে দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষাগুরু সর্ব্বত্রই যে বিভিন্ন ব্যক্তি হইবেন, তাহার কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। দীক্ষাগুরু যদি শিষ্যের অভিলষিত ভজন শিক্ষা দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে অবশ্য শিক্ষাচার্য্য রূপে বরিত হইবেন। দীক্ষাগুরু প্রায়শঃ একই ব্যক্তি হন। কিন্তু শিক্ষা গুরু সাধনার ভিন্ন ভিন্ন স্তরে আবশ্যক হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। অতএব শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট গুরু-পদাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ না হইলে এক গুরুর শ্রীচরণকমল হইতে অন্য সদ্‌গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করা, তত্ত্বজ্ঞান-লোভী শিষ্যের দোষাবহ হয় না। তাই বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা বিধি-সঙ্গত নহে। করিলে গুরু-গৌরব হানি রূপ অপরাধ-কূপে পতিত হইতে হয়। সুতরাং সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব হইয়া উঠে। এই জন্যই শ্রীজীব গোস্বামী মধুর ভজন-তত্ত্বের উপদেশ দিয়া কৃষ্ণদাসকে সাবধান করিয়া বলিলেন——

"শুন ওহে কৃষ্ণদাস কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য।
হৃদয় চৈতন্যদাস গুরু সে অবশ্য॥
কৃষ্ণ-মন্ত্র দাতা তেঁহো তাঁর কৃপা হৈতে।
এই সব প্রাপ্ত তাঁর কৃপার সহিতে॥
তাতে অপরাধ কৈলে সব যায় ক্ষয়।
এই মোর বাক্য তুমি রাখিবে হৃদয়॥" প্রেঃ বিঃ।

কৃষ্ণদাস অবনত মস্তকে গুরু আজ্ঞা মানিয়া লইলেন। অনন্তর কুঞ্জ-গৃহের বহির্ভাগে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া বহু প্রণাম করিলেন।

কৃষ্ণদাস সেইদিন হইতেই ব্রজগোপীদের আচরিত মধুর-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভজনানন্দের অমিয়-প্রবাহে তনু-মন ভাসাইয়া দিলেন। সেই দিন হইতেই কৃষ্ণদাস প্রেমময়ীর লীলা-রাজ্যের পথের পথিক হইলেন। তিনি অন্তশ্চিন্তিত তৎসেবনোপযোগী দেহে দিবানিশি শ্রীরূপ মঞ্জরীর কৃপা নিদেশ অনুসারে পরমানন্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-সেবা করিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রীজীবগোস্বামীর নিকট অধ্যয়ন করেন, তদ্ভিন্ন অধিকাংশ সময় নিজ কুঞ্জে বসিয়া কায়মনো-বাক্যে সাধন ভজনে নিবিষ্ট থাকেন——

"যে শুনিল সে হইতে করেন সাধন।
গোঁসাঞের স্থানে পড়ে, কুঞ্জে বসিয়া স্মরণ॥
রাত্রে বসি রাধাকৃষ্ণ লীলাবেশ চিত্তে।
কত ভাব উঠে তাহা ভাবিতে ভাবিতে॥" প্রেঃ বিঃ।

* * * * * *

"রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জ-সেবা কায়মনোবাক্যে।
সদা লীলা দর্শন চিত্তে করি ঐক্যে॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সঙ্গে পরম হরিষে।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমসেবা করেন মানসে॥
এইরূপে সাধনেতে কত দিন যায়।
সাধন পক্কতা তাঁর হইল হিয়ায়॥" শ্যাঃ প্রঃ।

সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণদাস সাধন-সিদ্ধ দশায় উপনীত হইলেন। এইবার তাঁহার চির-পোষিত আশালতা ফলবতী হইবার উপক্রম হইল। একদিন সিদ্ধ দেহের স্ফূর্ত্তিতে তিনি শ্রীযমুনা পুলিনবর্ত্তী নিত্য শ্রীরাস মণ্ডলে উপনীত হইলেন এবং শ্রীরাধাশ্যামের প্রেমময় লীলা-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—কুসুমিত কল্প-কুঞ্জ-কুটীরে শ্রীরাধাকৃষ্ণ সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাস বিহার করিতেছেন।

গীত-বাদ্যের মধুর ঝঙ্কারে শ্রীরাস-মণ্ডল পূর্ণ আনন্দময়। আর সেই আনন্দ-তরঙ্গের তালে তালে আনন্দময়ী ব্রজললনাগণ পরস্পরের করাবলম্বন করিয়া মণ্ডলাকারে নৃত্য করিতেছেন। মধ্যভাগে শ্রীরাধা-মদনমোহন পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া প্রেম-বিবশ প্রাণে অপূর্ব্ব নৃত্যানন্দে নিমগ্ন। আ মরি! সে নৃত্য কলার কি তুলনা আছে? নাচিতে নাচিতে শ্রীরাধার বামপদের কনক নূপুর খসিয়া পড়িল। যেন অনুভূতি নাই—লক্ষ্যও নাই। সকলেই প্রেমে বিহ্বল—আনন্দে আত্মহারা। রাসান্তে রাসেশ্বরী ও রাস-রসিক শ্রম-শান্তির নিমিত্ত কুঞ্জ-কুটীরে বিলাস-পর্য্যঙ্কে গিয়া শয়ন করিলেন। নিশা অবসান হইল। সময় বুঝিয়া শারী-শুক 'রাই জাগ, শ্যাম জাগ', রবে প্রভাতী গাহিল। সখীগণ অবসর বুঝিয়া রসালসে অবসাঙ্গ শ্রীরাধাশ্যামকে জাগরিত করিলেন। অনন্তর সকলেই নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিলেন। শ্রীরাধার নূপুর যে কুঞ্জাঙ্গনে পড়িয়া রহিল, শ্রীরাধা স্বয়ং কি সখীগণ কেহই তখন লক্ষ্য করিলেন না।—

"একদিন রাধা কৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
কুঞ্জে নৃত্যগীত সবে বিবিধ তরঙ্গে॥
রাধা সখীগণ নিজ ভুজে অন্যভুজে।
মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র তাহা অধিক বিরাজে॥
নৃত্য করে সখীগণ আনন্দিত মন।
মধ্যে নৃত্য করে কৃষ্ণ মদনমোহন॥
গান বাদ্য করে তাহে সব সখীগণ।
রাধা নৃত্য করে কৃষ্ণ করয়ে দর্শন॥
বিবিধ বিচিত্র বাদ্য সখীগণ গায়।
রাধিকা নাচয়ে কভু সখীরে নাচায়॥
এই মত কৃষ্ণসুখ লাগিয়া নর্ত্তন।

এই রসে সবে মত্ত জুড়ায় নয়ন॥
রাধিকার নৃত্য তাহে অত্যন্ত প্রচুর॥
খসিয়া পড়িল বাম পদের নূপুর॥
আপনে না জানে সখীগণ না জানিল।
চরণে আছয়ে কিংবা কোথায় পড়িল॥
নৃত্য অন্তে পালঙ্কে শয়ন করে যাঞা।
সখীগণ নিরখয়ে গবাক্ষে নেত্র দিয়া॥
রতি রসে পোহাইল রাত্রি হৈল শেষ।
সখীগণ উঠিবারে করিলা আদেশ॥
বহুক্ষণে উঠি রসালস অঙ্গ ভরে।
লাজভয়ে উঠি যায়েন নিজ নিজ ঘরে॥
সখীগণ চলি গেলা নিজ নিকেতনে।
পড়িয়া রহিলা নূপুর কেহ নাহি জানে॥" প্রেঃ বিঃ।

কৃষ্ণদাস প্রেম-বিভাবিত দিব্য নয়নে সে লীলা-রঙ্গ সকলেই দর্শন করিলেন। শ্রীমতীর নূপুর কুঞ্জাঙ্গনে পড়িয়া রহিল দেখিয়া, তিনি যেমন তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে যাইবেন, অমনই তাঁহার বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল। দেখিলেন—আনন্দময়ের আনন্দধামে আনন্দের সুপ্রভাত হইয়াছে। প্রভাত সমীরণ ফুটন্ত-কুসুম-সুবাস চুমিয়া ঘুমন্ত বৃক্ষ-বল্লরীগুলিকে নাচাইয়া দোলাইয়া জাগাইয়া ফিরিতেছে। আনন্দে যমুনা তরুণ তপনের অরুণ কিরণ অঙ্গে মাখিয়া তরঙ্গোল্লাসে বহিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণদাস প্রেমে বিবশাঙ্গ হইয়া কুঞ্জ-সংস্কারে গমন করিলেন। তিনি নিত্যই এই সময়ে শ্রীরাসমণ্ডলে ঝাঁটি দিতে যান। আজও যাইতেছেন; কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা আজ যেন তাঁহাতে অধিক প্রেমাবেশ লক্ষিত হইতেছে। তিনি কুঞ্জাঙ্গনে উপনীত হইয়া শ্রীচরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া

গড়াগড়ি দিলেন। নয়নে দর-দর-ধারে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়া কুঞ্জের ধূলি-পটল পরিসিক্ত করিতে লাগিল।——

"নিরখয়ে পদচিহ্ন দণ্ডবৎ করে।
নয়নে বহয়ে নীর আনন্দ অন্তরে॥
পত্রে ঢাকা পড়িয়াছে রত্নের নূপুর।
তাহার সৌরভে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর॥" প্রেঃ বিঃ।

কৃষ্ণদাস কুঞ্জ-সংস্কার করিতে করিতে কল্পতরু-মূলে দেখিলেন—বাস্তবিকই একটী কনক-নূপুর পত্রাবৃত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহার স্বচ্ছ স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি, মধ্যাহ্ন-তপনের কিরণকেও পরাস্ত করিয়াছে। সৌরভে শুষ্ক-হৃদয়েও প্রেমানন্দের সুধা-ধারা উৎসারিত করিতেছে। কৃষ্ণদাস তাহা নিরীক্ষণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিবশ-প্রাণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।——

"তরুমূলে দেখিলা কনক বজরাজে।
সূর্য্য যেন উদয় হ'য়েছে কুঞ্জ মাঝে॥
কনক দর্পণ প্রায় নূপুরের জ্যোতি।
শ্যামানন্দ গোসাঞি দেখিয়া মূর্চ্ছিতি॥
* * * * *
চেতন পাইয়া "রাধা-কৃষ্ণ" বলি ডাকে।
চতুর্দ্দিকে চাহে, রাধাকৃষ্ণ নাহি দেখে॥
প্রেমেতে আকুল হোয়ে করেন রোদন।
কবে মোরে রাধাকৃষ্ণ দিবে দরশন॥" শ্যাঃ প্রঃ।

বহুক্ষণ পরে কৃষ্ণদাস ধৈর্য্য ধারণ করিলেন—তাঁহার হৃদয়ের প্রেমাবেগ কিছু শান্ত হইল। তিনি শ্রীনূপুর কণ্ঠে ধারণ করিয়া কুঞ্জে ঝাঁটি দিতে লাগিলেন। সাত্ত্বিক ভাব-কুসুমে তাঁহার অঙ্গ পরিশোভিত হইল—হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রেমানন্দের তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিল—আর

নয়ন-কমল হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রুর মন্দাকিনী-ধারা ঝরিতে লাগিল।

অনন্তর কৃষ্ণদাস শ্রীনূপুর মস্তকে ধারণ করিয়া এইরূপ প্রেম-বিহ্বল ভাবে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট উপনীত হইলেন। শ্রীজীব সেই শ্রীনূপুর দর্শন করিয়া সকল ব্যাপারই বুঝিতে পারিলেন।——

"ভাবিলেন, মনে এই যাঁহার নূপুরে।
হাতে তুলি লৈয়া তারে দণ্ডবৎ করে॥
বুকে মুখে লাগাইল চক্ষে, লৈয়া মাথে।
কণ্ঠ রুদ্ধ হৈলা গোসাঞি পড়িলা ভূমেতে॥" প্রেঃ বিঃ।

শ্রীজীব, শ্রীনূপুর স্পর্শে উদ্দাম প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, দেখিয়া কৃষ্ণদাস শশব্যস্তে তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। শ্রীজীব সেই শ্রীনূপুর কখন মস্তকে কখন হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপার আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। পরে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া প্রেম-গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিলেন—"কৃষ্ণদাস! তুমি জন্ম-জন্মান্তরে না জানি কি সাধনাই করিয়াছিলে? তাহারই ফলে তুমি এই দুর্লভ বস্তুর দর্শন লাভ করিলে? তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। আজ তুমি ধন্য হইলে, আমারও জীবন ধন্য করিলে।"—বলিতে বলিতে গোসাঞি প্রেমে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া শ্যামানন্দকে হৃদয়ে ধরিয়া বলিলেন—"কৃষ্ণদাস! তোমার মস্তকে না চরণ-কুঙ্কুম লাগিয়াছে?" এই বলিয়া পুনঃপুন তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন।——

"কৃষ্ণদাসে চুম্ব দিল আলিঙ্গন বুকে।
চরণ-কুঙ্কুম লাগিয়াছে, তোমার মস্তকে॥
পুনঃপুন আঘ্রাণ লয় মস্তকে তাঁহার।
ভাগ্য করি মানয়ে জীবন আপনার॥" প্রেঃ বিঃ।

এদিকে শ্রীমতি নিজ মন্দিরে গমন করিয়া দেখিলেন, শ্রীচরণে

নূপুর নাই। তখনই তিনি শ্রীললিতাকে নূপুরের অন্বেষণে পাঠাইলেন। শ্রীললিতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিয়া শীঘ্র কুঞ্জ-প্রাঙ্গনে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় প্রেম-বিবশাঙ্গ কৃষ্ণদাসকে ঝাড়ু দিতে দেখিয়া স্নেহপূর্ণ করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপু! তুমি অতি প্রত্যুষেই কুঞ্জে ঝাড়ু দিতেছ, তুমি কি আমার বধূর নূপুর কুড়াইয়া পাইয়াছ? বধূ আমার এই পথে যমুনায় স্নান করিতে গিয়াছিলেন, কুঞ্জ পরিক্রমা করিয়া বাড়ী যাইবার কালে তাঁহার বাম পদের নূপুরখানি খুলিয়া পড়িয়াছে। সোণার নূপুর তা'র অনেক মূল্য। বাছা! তুমি যদি কুড়াইয়া পাইয়া থাক তবে আমায় ফিরাইয়া দাও, আমি তোমাকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিব।"

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর কথায় কৃষ্ণদাসের বিস্ময়-বিহ্বলতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি ধীর মধুর বাক্যে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীললিতা যথার্থ পরিচয় গোপন করিয়া প্রীতি-ব্যঞ্জক স্বরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"কৃষ্ণদাস! এই ব্রজেই আমাদের বাস। আমি কনোজ ব্রাহ্মণের মেয়ে। আমার নাম রাধাদাসী।"

এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস স্বভাব-সুলভ বিনয়-মধুর বাক্যে কহিলেন—"ঠাকুরাণি! আমি একটী নূপুর কুড়াইয়া পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহা ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত। বিশেষতঃ তাহা স্বয়ং শ্রীরাধার নূপুর বলিয়াই বোধ হয়; নতুবা মনুষ্যের অলঙ্কার হইলে তাহা স্পর্শে এরূপ প্রেম ভাবের উদয় হইত না। সুতরাং এ নূপুর তোমার বধূর বলিয়া বোধ হয় না। তবে——

"তোমার নূপুর এই যদি সত্য হয়।
দেখিয়া তোমার ঘর দিব ত নিশ্চয়॥
তোমার গ্রামেতে সর্ব্বলোক দেখাইব।
তোমার নূপুর বলি সে লোকে কহিব॥

দশ পাঁচ লোক সাক্ষী রাখিব সেইখানে।
তোমার নূপুর আমি দিব ততক্ষণে॥" শ্যাঃ প্রঃ।

শ্রীললিতা দেখিলেন, কৃষ্ণদাসের মন ভুলান সহজ নহে। কৃষ্ণদাসের ভাবপূর্ণ প্রীতি-ব্যবহারে শ্রীললিতার ছদ্ম-চাতুরী আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। তিনি স্নেহ-বিগলিত স্বরে কহিলেন—"কৃষ্ণদাস! আমি তোমাকে বঞ্চনা করিয়া এতক্ষণ কথা কহিতেছিলাম। বাস্তবিক নূপুর শ্রীরাধারই বটে। তোমার কথাই সত্য। আমি তোমার প্রতি বিশেষ প্রীত হইয়াছি; এখন——

"কি বর মাগিবে বল তোমারে সে দিব।
বাঞ্ছা সিদ্ধি করিয়া নূপুর লয়ে যা'ব॥" শ্যাঃ প্রঃ।

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর অলৌকিক আকার-প্রকার দেখিয়া প্রথম হইতেই কৃষ্ণদাসের মনে কেমন এক ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। দর্শনাবধি হৃদয়ে প্রেম-পুলকানন্দ ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছিল। কৃষ্ণদাস তাহাতে বিহ্বল হইয়া ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন——

"————শুন ঠাকুরাণি!
কে তুমি তোমার রূপ দেখিব সে আমি॥
পরিচয় দিয়া মোরে দরশন দিবা।
যে কিছু মনের বাঞ্ছা তোমারে কহিবা॥" শ্যাঃ প্রঃ।

কৃষ্ণদাসের প্রাণভরা প্রেমের ব্যাকুলতায় প্রেমময়ী শ্রীরাধা অতিশয় পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। হইবারই তো কথা! তিনি যে নিত্য-লীলায় সেবা-প্রাণা নিত্য-সহচরী! কৃষ্ণদাসের সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়ের সাধ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত,—তাঁহাকে সুরবর বাঞ্ছিত দুর্লভ কৃপা-ভূষণে ভূষিত করিবার নিমিত্তই বুঝি আজ কুঞ্জে পাদ-ভূষণ বিস্মৃতি রূপ এই এক অপূর্ব্ব লীলারঙ্গের অভিনয়? ধন্য সাধনা!—ধন্য সুকৃতি!!

শ্রীললিতা কৃষ্ণদাসকে কুঞ্জের অদূর অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন— "কৃষ্ণদাস! আমার নাম রাধাদাসী—ললিতা। তুমি আমার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ; কিন্তু—

"দেখিয়া আমার রূপ অধৈর্য্য হইবে।
অধৈর্য্য হইলে রূপ কেমনে দেখিবে।" শ্যাঃ প্রঃ।

কৃষ্ণদাস চমকিত হইলেন। এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিতে তাঁহার অন্তর্বাহ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে হৃদয়-তন্ত্রী এক অলক্ষ্য শক্তিতে শত তারে বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে শতমূর্চ্ছনার তরঙ্গ খেলিয়া গেল। অঙ্গ অবশ—পুলকাঞ্চিত। অপাঙ্গে দর-দর-ধারে অশ্রু বিগলিত। কৃষ্ণদাস নীরব নিশ্চেষ্ট ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর প্রেম-বিকম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন—"দেবি! আপনার কৃপাতেই আমি ধৈর্য্য ধারণ করিব।"

শ্রীললিতা মৃদু হাসিয়া কৃষ্ণদাসকে নয়ন মুদ্রিত করিতে বলিলেন। কৃষ্ণদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বহিরিন্দ্রিয়ের প্রভাব কমিয়া গেল। তিনি দিব্য-চক্ষু লাভ করিয়া দেখিলেন— তাঁহার নিভৃত হৃদয়-নিকুঞ্জে অনুরাগের পুত-আসনে শ্রীরাধাশ্যামের পার্শ্বে শ্রীললিতার কনক-প্রতিমা ঝলমল করিতেছে। কৃষ্ণদাসের নয়ন-মন সে অপরূপ রূপ তরঙ্গে ডুবিতে না ডুবিতে শ্রীললিতা তাঁহাকে নয়ন উন্মীলন করিতে বলিলেন। কৃষ্ণদাস চাহিয়া দেখিলেন— আমরি! মরি! হৃদয়-মন্দিরের সেই মহা মাধুরীময়ী শ্রীমূর্ত্তি এ যে মাধুর্য্যের অনন্ত উৎস উৎসারিত করিয়া—সৌন্দর্য্যে ভুবন আলো করিয়া তাঁহার সম্মুখে শোভা পাইতেছেন,—আহা! ঐ যে কুসুমিত-লতাকুঞ্জ বিমণ্ডিত মণি-বেদিকার উপরে দাঁড়াইয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বলা স্থিরা সৌদামিনী-বালা হাসিতেছেন!

শ্রীললিতার জ্যোতির্ম্ময়ী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃষ্ণদাস একান্ত-

অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তৃষিত নয়ন-চকোর সে রূপ-মাধুর্য্য-সুধা-সিন্ধুর কণিকা মাত্র আস্বাদ গ্রহণ করিতে না করিতে আনন্দাবেশে নিমীলিত হইয়া পড়িল। উদ্দাম প্রেম-তরঙ্গে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কৃষ্ণদাস মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ধন্য কৃষ্ণদাস! যে সৌভাগ্য লাভের জন্য ব্রহ্মাদি সুর-সত্তমগণও সর্ব্বদা আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, জানিনা, কৃষ্ণদাস! আজ তুমি কি পুণ্য-পুঞ্জ প্রভাবে সে সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইলে। শ্রীবৈকুণ্ঠের রাজ-লক্ষ্মী কমলাও যে নিকুঞ্জ-সেবা-ব্রত লাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। অহো! আজ নিকুঞ্জরাজ্ঞী শ্রীরাধার প্রধানা সখী শ্রীললিতা, সাক্ষাৎ ভাবে কৃষ্ণদাসকে কৃপা করিয়া সেই দুর্লভ নিকুঞ্জ সেবার দাসী অঙ্গীকার করিলেন। মহা ভাগবত উদ্ধব; যে গোপীকার পদরেণু-ভিখারী, আজ সেই গোপীকামণি শ্রীললিতা স্বয়ং-মূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ হইয়া যাচিয়া যাচিয়া কৃষ্ণদাসকে অপার কৃপামৃত ধারায় অভিষিক্ত করিলেন! জানি না, এমন সৌভাগ্য লাভ আর কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে? তাই বলি, ধন্য কৃষ্ণদাস! ধন্য তোমার প্রেমভক্তির সাধনা!

কৃষ্ণদাসের প্রেমাবিষ্টতা কিঞ্চিৎ তিরোহিত হইল। তিনি শ্রীললিতার রাঙ্গা পা দু'খানি মস্তকে ধারণ করিয়া সেই শ্রীপদরজঃ-মলয়জ সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত করিতে লাগিলেন। স্তুতি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, বাক্য স্ফূর্ত্তি হইতেছে না, প্রেমাবেগে কণ্ঠ অবরুদ্ধ। কেবল নয়ন যুগল হইতে প্রেমাশ্রুরাশি বর্ষাসারের ন্যায় অবিরাম ঝরিতে লাগিল।——

"ললিতার চরণ ধরিয়া নিজ শিরে।
পদরেণু ভূষণ করিলা কলেবরে॥
প্রেমে গদ্‌গদ হৈয়া বাক্য নাহি স্ফুরে।
দেহ কম্প পুলকাশ্রু ঝর ঝর ঝরে॥" শ্যাঃ প্রঃ।

করুণামূর্ত্তি শ্রীললিতা কৃষ্ণদাসের ধূলি-ধূসরিত অঙ্গে স্নেহ-কোমল পদ্মহস্ত অর্পণ করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। কৃষ্ণদাস উঠিয়া বসিলেন। তখন শ্রীললিতা স্নেহের কম-কণ্ঠে বলিলেন—"কৃষ্ণদাস! তোমার মনের অভিলাষ কি? তুমি কি চাও?"

কৃষ্ণদাস কৃতাঞ্জলিপুটে প্রেম-বিকম্পিত স্বরে বলিলেন—দেবি! অন্য কিছুই আমি চাই না, তোমার দাসী হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবা করিব, এই আমার প্রাণের অভিলাষ!" শ্রীললিতা হাস্য পূর্ব্বক "তথাস্তু" বলিয়া কৃষ্ণদাসকে ভজন-সাধনের চরম-ক্রমের পরমাসিদ্ধি দান করিলেন। অনন্তর প্রীতি মধুর বাক্যে কহিলেন—"কৃষ্ণদাস তুমি কুঞ্জ-সেবা অবশ্যই লাভ করিবে। কিন্তু এই যথাবস্থিত দেহে তাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই।——

"এই দেহে না পাইবে রাধা কৃষ্ণের সেবন।
মানসিক সখী দেহে করিবে দর্শন॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী দাসীর কুঞ্জেতে রহিবে।
রাধা কৃষ্ণ রাস লীলা দর্শন করিবে॥
এ দেহের ভোগাভোগ আছে যতদিন।
জীবের সঙ্গেতে তুমি থাক ততদিন॥
রাধাকৃষ্ণরাসলীলা কর আস্বাদন।
দেহান্তরে পাবে রাধা কৃষ্ণের চরণ॥
এই নিত্য মন্ত্র, তুমি করহ গ্রহণ।
স্মরণ করিলে হবে রাধিকা দর্শন॥ শ্যাঃ প্রঃ।

এই বলিয়া শ্রীললিতা কৃপা করিয়া কৃষ্ণদাসকে নিজ মন্ত্র প্রদান করিলেন। কৃষ্ণদাস সেই শ্রীমন্ত্র প্রাপ্তি মাত্র প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ প্রান্তে নিপতিত হইলেন। শ্রীললিতাদেবী তাঁহাকে স্নেহাদর পূর্ব্বক কোলে তুলিয়া লইয়া বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তারপর প্রীতির অমিয়-মাখা স্বরে বলিলেন—"কৃষ্ণদাস! শ্রীমতির নূপুর কোথায় রাখিয়াছ, আনিয়া দাও। আর আমি বিলম্ব করিতে পারি না।"

কৃষ্ণদাস নূপুর আনিতে গমন করিলেন। তাঁহার কুটীরে কুঞ্জের তৃণগুল্ম পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত একটী লোহার ক্ষুরপ্রা ছিল। কৃষ্ণদাস শ্রীনূপুরখানি সেই ক্ষুরপ্রা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি কুটীরে যাইয়া দেখিলেন, সেই ক্ষুরপ্রা খানি শ্রীনূপুর স্পর্শে সুবর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণদাসের হৃদয় হর্ষ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। তিনি শ্রীনূপুর মস্তকে করিয়া লইয়া শ্রীললিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। শ্রীললিতা বলিলেন—"কৃষ্ণদাস! শ্রীরাধার পদচিহ্ন তোমার মস্তকে চিরশোভিত হউক।"

এই বলিয়া শ্রীললিতা সেই শ্রীনূপুর কৃষ্ণদাসের ললাটদেশে স্পর্শ করাইলেন। স্পর্শমাত্র তাঁহার ললাটে নূপুরাকৃতি শ্রীহরিমন্দির তিলক পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং নূপুরের চূড়াস্পর্শে সেই তিলকের মধ্য ভাগে একটী বিন্দু প্রকাশ পাইল। কৃষ্ণদাস প্রেমানন্দে বিবশ হইয়া বহুতর নতি স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীললিতা তাঁহাকে স্নেহ মধুর বাক্যে বহু আশীর্ব্বাদ ও আশ্বাস প্রদান করিয়া শ্রীমুখে আদেশ করিলেন—"কৃষ্ণদাস! তুমি শ্রীরাধাশ্যামের অপার আনন্দ বিধান করিয়াছ; অতএব আজ হইতে জগতে তোমার দুঃখী-কৃষ্ণদাসের নামের পরিবর্ত্তে "শ্যামানন্দ" নাম প্রকাশিত হউক। শ্রীজীব গোস্বামী ব্যতীত এই সকল কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। অতএব যাও শ্যামানন্দ! নিজ কুটীরে গমন কর; আমিও স্বস্থানে প্রস্থান করি।"

শ্যামানন্দ শ্রীললিতার কথা শুনিয়া ছল-ছল-করুণ-নয়নে তাঁহার শ্রীমুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর শ্রীনূপুরকে প্রণাম করিয়া

শ্রীললিতার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। নয়ন-সলিলে শ্রীচরণ-কমল পরিসিক্ত হইয়া উঠিল। শ্রীললিতা স্নেহ-মধুর বাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিয়া শ্রীনূপুর লইয়া বিদায় হইলেন। দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াই কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। তখন শ্যামানন্দ——

"প্রেমেতে আকুল হৈয়া কুঞ্জে কুঞ্জে ধায়।
কোথায় ললিতা বলি ডাকে উভরায়॥
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া গোসাঞি নিকুঞ্জে আইলা।
শ্রীজীব গোসাঞিরে দেখি চরণে পড়িলা॥" শ্যাঃ প্রঃ।

শ্রীজীব গোস্বামী শ্যামানন্দের সেই অপূর্ব্ব রূপান্তর ও ভাবান্তর দর্শন করিয়া যার-পর-নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দেখিলেন, তাঁহার দেহ হইতে দামিনী-দামের ন্যায় গলিত সুবর্ণ-দ্যুতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। আর সে স্নিগ্ধ জ্যোতি যাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে, সে-ই প্রেমানন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছে। তরু, লতা, পশু, পক্ষী সকলই যেন তাঁহাকে দেখিয়া পুলকভরে নৃত্য করিতেছে। শ্রীজীব বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া কহিলেন—"কৃষ্ণদাস! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমার এরূপ অপূর্ব্ব কাঞ্চন-কান্তি কিরূপে হইল?"

শ্যামানন্দ প্রেম-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—"প্রভো! আপনার শ্রীচরণ-রেণু স্পর্শেই এরূপ হইয়াছে।"

শ্রীজীবের আগ্রহ আরও বর্দ্ধিত হইল। বুঝিলেন, শ্রীরাধার নূপুর লইয়া নিশ্চয় কোন এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। তিনি শ্যামানন্দকে নিকটে বসাইয়া বলিলেন—"না, না কৃষ্ণদাস! তুমি কথা গোপন করিতেছ। তুমি আজ নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়াছ; নতুবা এরূপ পরিবর্ত্তন কখনই সম্ভব হইতে পারে না।——

"কে দিল তিলক তোমায়, কি নাম ইহার।
প্রেমে পুলকিত দেহ নেত্রে জলধার॥

শ্রীহরিমন্দির তোমার তিলক আছিল।
এ কোন তিলক কহ কে তোমারে দিল॥
বঞ্চনা করিয়া তুমি, কহিলে আমারে।
হইল কৃষ্ণের কৃপা দেখিয়ে তোমারে॥" শ্যাঃ প্রঃ।

শঙ্কা-সঙ্কোচ-সমাকুল হৃদয়ে শ্যামানন্দ কহিলেন—"প্রভো! এ সকল আপনার কৃপাতেই লাভ হইয়াছে। এই যে ললাটে তিলক, ইহাও আপনার কৃপা প্রদত্ত পদ-চিহ্ন।"

এই সময়ে শ্রীজীব সহসা দেখিতে পাইলেন, শ্যামানন্দের হৃদয়-মধ্যে বস্ত্রাবৃত কি এক উজ্জ্বল বস্তু লুকান রহিয়াছে। তাহার বিমল প্রভা বস্ত্র ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। শ্রীজীব গোস্বামী আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণদাস! তোমার বস্ত্রের অভ্যন্তরে ও কি দেখা যাইতেছে?"

শ্যামানন্দ সুবর্ণ ক্ষুরপ্রা খানি বাহির করিয়া দেখাইলেন। তদ্দর্শনে শ্রীজীব অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল, বল, কৃষ্ণ-দাস! তোমার এই লোহার ক্ষুরপ্রা কিরূপে সোণা হইল?"

শ্যামানন্দ করযোড় করিয়া নিবেদন করিলেন—"প্রভো! সে সকল কথা নিভৃতে আপনাকে নিবেদন করিব।"

শ্রীজীব, শ্যামানন্দের মুখে আনুপূর্ব্বিক সকল বিবরণ অবগত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন। প্রেমাবেশে কোলে লইয়া বলিলেন—"বৎস! কৃষ্ণদাস! আজ হইতে আমি তোমার প্রেম-মূল্যে বিক্রীত হইলাম। আজ হইতে তোমার কৃপা সিদ্ধ "শ্যামানন্দ" নামই বৈষ্ণব সমাজে প্রকাশিত হইল।"

শ্যামানন্দ শ্রীজীবের চরণ-প্রান্তে পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন, শ্রীজীবও তাঁহাকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্যামানন্দের এই অভিনব পরিবর্ত্তের সংবাদ সমগ্র

ব্রজ মণ্ডলে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তখন সকলেই কৃষ্ণদাসের এই "শ্যামানন্দ" নাম, আর মধ্যবিন্দু যুক্ত কৃষ্ণ-পদাকৃতি শ্যামানন্দী তিলক ধারণ, শ্রীজীব গোস্বামীর কৃপার নিদর্শন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। শ্যামানন্দ এইরূপে পরমানন্দে শ্রীব্রজ ধামে বাস করিতে লাগিলেন। "রসিক-মঙ্গল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে——

"ভৃত্যের প্রকাশ প্রভু অপেক্ষা করিয়া।
ব্রজপুর নিরবধি দেখেন ভ্রমিয়া॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমিয়া দেখেন সর্ব্ব স্থান।
প্রেমে গদ্‌গদ অশ্রু বহে অবিশ্রাম॥
কবে কৃষ্ণ প্রাণপতি পাইব বলিয়া।
বৃন্দাবনে রাসস্থলে ধূলি গড়ি দিয়া॥
বৈরাগ্যে আনন্দ চিত্তে বিভোর অন্তরে।
সম্ভাষণ করেন সব কৃষ্ণ সহচরে॥
জীব গোসাঞি ঠাকুর শ্রীহরিপ্রিয়া দাস।
তা' সবার স্থানে কৈলা সতত বিলাস॥
প্রেমাবেশে নিরবধি করেন ক্রন্দন।
ভক্তি-শাস্ত্র পড়েন আর করেন শ্রবণ॥
প্রেমভক্তি অনুক্ষণ করেন বিলাস।
এই রূপে প্রভু ব্রজপুরে কৈলা বাস॥"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষা।

সুগন্ধি কুসুম বিকসিত হইলে তাহার মধুর সৌরভ যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, শ্যামানন্দের নামও সেইরূপ দেখিতে দেখিতে শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। সকলেই বুঝিলেন, শ্রীজীব গোস্বামীর কৃপাতেই দুঃখী-কৃষ্ণদাস "শ্যামানন্দ" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের মধ্যে এক ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। কৃষ্ণদাস শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভুর শিষ্য হইয়া পুনরায় শ্রীজীব গোস্বামীর পদাশ্রয় করিলেন। আর শ্রীজীবও জানিনা কি বুঝিয়া তাহাকে শিষ্য অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। ইহা তো সম্পূর্ণ সদাচার বিরুদ্ধ। ব্রজবাসীভক্তগণ এই কথা লইয়া দিবানিশি জল্পনা করিতে লাগিলেন।——

"শ্রীহৃদয়ানন্দ গোঁসাঞের সেবক ইহো হয়।
তাঁহারে ছাড়িয়া কৈল জীব-পদাশ্রয়॥
এই কথা কহে সর্ব্ব ব্রজবাসীগণ।
সকল বৈষ্ণবগণ করিলা শ্রবণ॥
শুনিয়া বৈষ্ণব সব বিচার করিল।
শ্রীজীব এমন কার্য্য কি বুঝি করিল।
কেহ বলে শাস্ত্রে কিছু আছয়ে বিধান।
না হ'লে কেমনে এই গুরু হয় আন॥
মহা সাধু সরস্বতী হয় কণ্ঠানন।

বুঝিয়া করিলা কার্য্য কে তাহা জানিবে।
এ কথা বিচার হৈলে অবশ্য শুনিবে॥" শ্যাঃ প্রঃ।

এইরূপ নানাজনে নানারূপ বিচার সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া শ্রীজীব গোস্বামীকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। ইহাতে সেই সময় শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রীজীব গোস্বামীর যে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। যাহা হউক এই ঘটনার পর শ্রীব্রজধাম হইতে যে সকল ভক্ত গৌড়ে আগমন করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীপাট অম্বিকায় যাইয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুকে কথা প্রসঙ্গে শ্যামানন্দের বিষয় সমস্ত জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন—"গোসাঞি ! দুঃখী কৃষ্ণদাস আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে শ্রীজীবের শরণ লইয়াছে। শ্রীজীব তাহার নাম শ্রীশ্যামানন্দ দাস রাখিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বারা "শ্যামানন্দী তিলক" নামে এক নূতন তিলকেরও প্রকাশ করিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি অতিমাত্র বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন—কি আশ্চর্য্য !——

"মহাপ্রভু হেন কর্ম্ম কভু নাহি করে।
গুরু ছাড়ি গুরু করে না শুনি সংসারে॥
এ কথা বুঝিব প্রভুর ভক্তগণ লৈয়া।
এত বলি নিজ ভক্ত আনিলা ডাকিয়া॥" শ্যাঃ প্রঃ।

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য কয়েকজন বিজ্ঞ বৈষ্ণব শিষ্যকে সেই দিনই শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে আদেশ করিলেন। বলিয়া দিলেন—"তোমরা শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া দুঃখী কৃষ্ণদাসকে আমার কাছে বাঁধিয়া আন। আমি

একান্ত ছাড়িয়া না দেন; তাহা হইলে আমি এই পত্র দিতেছি শ্রীজীবকে প্রদান করিবে এবং তাহার প্রত্যুত্তর আনিবে।”

পত্র লইয়া বৈষ্ণবগণ সেই দিনই শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিবেন এইরূপ স্থির হইল। অনন্তর শ্রীহৃদয় চৈতন্য প্রভু আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—“অহো ! কি স্পর্দ্ধা ! কৃষ্ণদাস আদিগুরু ত্যাগ করিয়া পুনরায় অন্য গুরু করিল ? ভাল ! ভাল ! কৃষ্ণদাস যদি সাক্ষাৎ রূপেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া থাকে, তবে আমরা সকলে গিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রয় লইব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী লক্ষ লক্ষ ভক্ত ছিলেন ; কিন্তু কই, তাঁহাদের মধ্যে এরূপ ঘটনা তো শুনি নাই। যে ব্যক্তি গুরুদ্রোহী বা ভক্তদ্রোহী সে কুম্ভীপাক নরকে গমন করে এবং শ্রীভগবানও তাহার প্রতি প্রসন্ন হন না। ইহাই শাস্ত্রের উক্তি। শ্রীকৃষ্ণের স্থানে অপরাধ হইলে সাধু ভক্তগণের সঙ্গ-গুণে তাহার খণ্ডন হয়, সাধু রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু তাঁহাকে সে বিপদ হইতে রক্ষা করেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের স্থানে অপরাধ হইলে তাহার আর পরিত্রাণের উপায় নাই ; ইহাইতো শ্রীমহাপ্রভু ধর্ম্মের রীতি, ইহাই তো শাস্ত্র যুক্তি ! তবে গুরু অবৈষ্ণব হইলে তাঁহাকে ত্যাগ করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে। আমি যদি কৃষ্ণদাসের অবৈষ্ণব গুরুই হই, তাহা হইলে কৃষ্ণদাস আমাকে ত্যাগ করে করুক, দুঃখ নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একবার সমগ্র বৈষ্ণব-মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া বিচার করিয়া দেখিব। তাহাতে আমি অবৈষ্ণব বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে অবশ্যই শ্রীজীব গোস্বামীর শরণ গ্রহণ করিব। অতএব যাও বাপু ! তোমরা শীঘ্র শ্রীবৃন্দাবনে গমন কর এবং শ্রীজীবের লিখন আনিয়া আমার উৎকণ্ঠা নিবারণ কর। যদি সত্যই কৃষ্ণদাস শ্রীজীবকে গুরু করিয়া থাকে, তবে——

“সর্ব্ব ভক্তগণে আমি আনিব ডাকিয়া।

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়া এইরূপ নানাবিধ আক্ষেপ প্রকাশ করিতে করিতে ভক্তগণকে বিদায় দিলেন।

যথা সময়ে সেই ভক্তগণ শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের লিখন প্রদান করিলেন। শ্রীজীব শশব্যস্তে তাঁহাদিগকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক স্বাগত কুশল ও তাঁহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। ভক্তগণ যথাযথ পরিচয় প্রদান করিলে শ্রীজীব যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন এবং অম্বিকার অধিকারী ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের পুনঃপুন কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কুটীরের মধ্যে একখানি তৃণাসন দেখাইয়া তাঁহাদিগকে অতি সমাদর পূর্ব্বক তাহাতে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা পদ ধৌত করিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। তখন শ্রীজীব গোস্বামী সেই পত্রখানি মস্তকে ধারণ করিয়া স্বগত পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন——

"শ্রীজীব বলেন শুন সর্ব্ব ভক্ত লোক।
আমি তাঁর কৃষ্ণদাসে করেছি সেবক॥
আমি তাঁর প্রধান সেবক তুল্য নহি।
আমারে তাড়না করি এত বাক্য কহি॥
শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর প্রভু মোর।
তেঁহো ভৃত্য জ্ঞান করেন সদা স্নেহ কোর॥
পণ্ডিত স্বরূপ আমি দেখিয়ে তাঁহারে।
মোরে ক্রোধ করেন প্রভু নাহিক নিস্তারে॥
তাঁর কৃপা হৈতে কৃষ্ণদাস ব্রজে আইলা।

তাঁহার সম্বন্ধে আমি নিকটে রাখিলা।
কৃষ্ণ কথা শুনাইয়া নির্ম্মল করিল॥
কে কহে সেবক মোর হৈলা কৃষ্ণদাস।
তাহারে ডাকিয়া তুমি আন মোর পাশ॥" শ্যাঃ প্রঃ।

এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের প্রেরিত বৈষ্ণবগণ কিছু অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহারা স্বগত ভাবিলেন—"অধিকারী ঠাকুরের প্রতি যাঁহার এরূপ বিশ্বাস, এরূপ অবিচলা ভক্তি, আবার নিজেও যিনি ভজন-বিজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তিনি যে কৃষ্ণদাসকে পুনরায় দীক্ষা-মন্ত্র দিয়া শিষ্য করিয়াছেন, একথা কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে।" তাঁহারা প্রকাশ্যে নিবেদন করিলেন—"প্রভো! ব্রজ হইতে দুইজন বৈষ্ণব শ্রীপাট অম্বিকায় গিয়া গোসাঞের নিকট কিছুদিন ছিলেন, তাঁহারাই গোঁসাঞিকে বলিলেন যে, কৃষ্ণদাস অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, সে প্রথম-কার দীক্ষাগুরু ত্যাগ করিয়া আপনার নিকট পুনরায় দীক্ষা লইয়াছে। আপনি তাহার গুরুদত্ত "কৃষ্ণদাস" নামের পরিবর্ত্তে শ্যামানন্দ নাম রাখিয়াছেন এবং তাঁহাকে এক নূতন তিলকও দিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া ইহার সত্যাসত্য জানিবার জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিয়াছেন।"

শ্রীজীব অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"বাপু! তোমরা সমস্ত ব্রজবাসী ভক্তগণকে ডাকিয়া আনিয়া আমার সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করিয়া সত্য মিথ্যা জানিতে পার। সত্য হইলে আমি নিশ্চয়ই অপরাধী হইব।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ মহা সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা শ্রীজীবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"গোঁসাঞি, আপনার বাক্যে আমাদের কোন অবিশ্বাস নাই। আপনি ঠাকুরের পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিয়া দিন, আমরা তাহা লইয়া অম্বিকায় গমন করি।"

শ্রীজীব পত্র লিখিয়া দিলেন। তাহা লইয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীপাট অম্বিকায় প্রত্যাগমন করিলেন। ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য পত্র পাঠ করিয়া অবগত হইলেন, তিনিই স্বপ্নাবেশে কৃষ্ণদাসকে এইরূপ কৃপা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে বৈষ্ণবগণকে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণদাসকে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বহুতর শিষ্যসেবক লইয়া শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। শ্রীজীব, বহুসমাদর পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর ব্রজধামস্থ সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলী লইয়া এক বিরাট সভার উদ্যোগ আয়োজন হইতে লাগিল।

পূর্ব্ব হইতেই ব্রজবাসী ভক্তগণের মনে এই বিষয়ে একটু সন্দেহের ছায়া প্রতিভাত হইয়াছিল। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া অধিকাংশ ব্রজবাসী ভক্তই সমবেত হইলেন। ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য তাঁহাদিগকে লইয়া শ্রীরাসমণ্ডলে কল্পকুঞ্জের প্রাঙ্গনে এক সভা করিলেন। অনন্তর শ্যামানন্দকে তথায় ডাকাইয়া আনিলেন। শ্যামানন্দ সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, মহান্তগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৃষ্ণদাস! তুমি এখন কাহার সেবক? কে তোমাকে এই শ্যামানন্দ নাম দিলেন, সত্য বল?"

শ্যামানন্দ করপুটে কহিলেন—"এ অধম জন্মে জন্মে শ্রীপাদ্ হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের দাসানুদাস। তিনিই স্বপ্নযোগে এ দাসাধমের "শ্যামানন্দ" নাম দিয়াছেন।"

এই কথা শুনিয়া মহান্তগণ পুনরায় বলিলেন—"শুন কৃষ্ণদাস! স্বপ্নের কথা কখনই সত্য হয় না। অপরাধী হইলে ত্রিসংসারে কোথাও স্থান পাইবে না। জানিও, গুরুস্থানে অপরাধ হইলে, কেহই সে অপরাধ মোচন করিতে সক্ষম হয় না

কৃষ্ণদাস! তুমি এখনও সত্য কথা বল। যদি তাহাতে তোমার অপরাধ জন্মে, আমরা সকলে মিলিয়া তোমাকে সে অপরাধ হইতে নিস্তার করিব। এই বৈষ্ণব সমাজে মিথ্যা বলিলে তোমাকে অবশ্যই নরকে গমন করিতে হইবে—যতদিন চন্দ্রসূর্য্য উদিত থাকিবে, ততদিন তোমার সে নরক হইতে উদ্ধার হইবে না। অতএব কৃষ্ণদাস! গোপনে যদি কাহারও সেবক হইয়া থাক তবে সে কথা নির্ভয়ে প্রকাশ কর। আমরা সত্যই বলিতেছি, তাহাতে তোমার অপরাধ হইলে মোচন করিব। স্বপ্নে যে গুরুকৃপা-লাভ করিয়াছ, এ কথা সাধুসমাজে প্রমাণ করিতে পারিবে না, ভণ্ড বলিয়া পরিচিত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া শ্যামানন্দ বিনীতভাবে করযোড় করিয়া কহিলেন—"আপনারা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে দণ্ড দুই সময় দিন; তাহার পর ইহার সত্যাসত্য বুঝিয়া বলিব।"

অনন্তর শ্যামানন্দ প্রেমানন্দপূর্ণ চিত্তে ধ্যানে উপবিষ্ট হইলেন এবং শ্রীললিতার প্রদত্ত কৃপামন্ত্র হৃদয়ে অনন্যমনে জপ করিতে লাগিলেন। জপিতে জপিতে তাঁহার আত্মা-মন-প্রাণ ও অন্তরের সমুদয় বৃত্তিগুলি সিদ্ধভাবে বিভাবিত হইয়া উঠিল। তিনি সেই ভাবসিদ্ধ গোপীদেহে শ্রীরাধাশ্যামের চির-প্রাণারাম নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন।

হায়! এই মধুরাদপি মধুর ভজন-তত্ত্ব, ক্ষুদ্র লেখনীমুখে মানবের সঙ্কীর্ণভাষায় পরিস্ফুট করিবার শক্তি আছে কি? এই সিন্ধুসম মহা-গভীর-তত্ত্ব কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, সাধনের ক্রমোৎকর্ষ অনুসারে স্বয়ং বুঝিবার বস্তু। আমরা ভজন-সাধনবিহীন অনধিকারী—সংসার-নরকের কৃমিকীট, সুতরাং সিদ্ধ রসিক ভক্তের হৃদ্গত মর্ম্ম আমরা বাস্তবিকই বুঝাইতে অক্ষম। যাঁহারা প্রেমভক্তির অতৃপ্ত লালসায় উন্মাদিত হইয়া শ্রীরাধাশ্যামের মধুর লীলারহস্যের অনুধ্যানে

বুঝাইতে সক্ষম—অন্যে নহে। অতএব প্রেমিক পাঠক! আপনি প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত দিব্যনয়ন উন্মীলন করিয়া দেখুন দেখি? আমাদের সাধক-শেখর শ্যামানন্দদেব সিদ্ধদেহে শ্রীকনকমঞ্জরী নাম্নী গোপ-ললনারূপে শ্রীরাধার মন্দিরে গিয়া কি করিতেছেন!

শ্যামানন্দ শ্রীরাধার মন্দিরের বহির্দ্বারে বসিয়া আকুলকণ্ঠে রোদন করিতেছেন। শ্রীরাধার সখীগণ তাঁহাকে এইরূপ ভাবে রোদন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্যামানন্দ কহিলেন——

"কনকমঞ্জরী নাম হও ব্রজবাসী।
ললিতার পায় মুঞি হইয়াছি দাসী॥
রাত্রিদিন ঠাকুরাণী সঙ্গেতে রাখিলা।
ঘরেতে যাইতে স্বামী মারিতে আইলা॥
পরাণ লইয়া মুঞি আইনু পলায়া।
কহ গিয়া—প্রাণ রাখ দরশন দিয়া॥" শ্যাঃ প্রঃ।

এই বলিয়া শ্যামানন্দ ব্যাকুলভাবে সখীগণের চরণে প্রণাম করিলেন! তাঁহার নয়নাপাঙ্গে অশ্রুর অবাধ উৎস উৎসারিত হইল। তিনি সেই নয়নজলে পরিপ্লুত হইয়া বহু কাতরতা জানাইলেন। সখীগণ সেই দণ্ডে শ্রীললিতার সমীপে উপস্থিত হইয়া শ্যামানন্দের কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীললিতা তখন শ্রীমতির তাম্বূল-সেবায় নিযুক্তা। সুতরাং শ্যামানন্দকে তাঁহার নিকট ডাকিয়া আনিবার জন্য সখীগণকে আদেশ করিলেন। শ্যামানন্দ সখীজন সমভিব্যাহারে শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা পুলকানন্দে বিভোর হইয়া গেল। দেখিলেন—তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকা রত্ন-পালঙ্কে শিরিষ-পেলব চমৎকার কেলিতল্পে উপবেশন করিয়া সুগন্ধি তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছেন। শ্রীললিতা স্বহস্তে

শ্রীমতির চরণসেবায় নিযুক্তা আছেন। শ্রীচম্পকলতা ধীরে ধীরে চামর ব্যজন করিতেছেন। সেই চির-আরাধ্যতম—সেই প্রাণের চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে দর্শন করিয়া শ্যামানন্দ (শ্রীকনকমঞ্জরী) উদ্দাম প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ক্ষণেক পরে মূর্চ্ছান্তে শ্রীরাধার পদতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। শ্রীরাধা পরম প্রীত হইয়া উঠাইতে আদেশ করিলে শ্রীললিতা স্নেহভরে তাঁহাকে কোলে তুলিলেন। কনকমঞ্জরী অঝোর নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শ্রীমতি অতিশয় স্নেহ সহকারে তাঁহার গাত্রে পদ্মহস্ত বুলাইতে বুলাইতে মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি জন্য কাঁদিতেছ? তোমার নাম কি? দাসীই বা কাহার? তোমার পিতামাতা কে? কোন্ গ্রামে বাস কর?"

কনকমঞ্জরী গললগ্নীকৃতবাসে করযোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন—

"শুনিয়া কহেন নাম, কনকমঞ্জরী।
তব পাদপদ্ম-সেবা মনে আশা করি॥
তোমার দাসীর দাসী হও ব্রজবাসী।
শ্রীরূপমঞ্জরী পাদপদ্মে আমি দাসী॥" শ্যাঃ প্রঃ।

এইরূপ সিদ্ধাবস্থার পরিচয় দিয়া শ্রীশ্যামানন্দ দেব সাধক অবস্থার সকল পরিচয় প্রদান করিলেন। যেরূপে তিনি শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য হইয়া শ্রীজীবের কৃপা শিক্ষার শ্রীললিতার অনুগ্রহ লাভ করেন, যেরূপে দুঃখী কৃষ্ণদাস নামের পরিবর্ত্তে শ্যামানন্দ নাম ও শ্যামানন্দী তিলক প্রাপ্ত হন, যেরূপে সেই নাম ও তিলক লইয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের বিষ-নয়নে পতিত হইয়াছেন এবং যে কারণে বৈষ্ণব সমাজ তাঁহার কৃপা সিদ্ধতার বিষয় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সমবেত হইয়াছেন, শ্যামানন্দ শ্রীমতির সমীপে সেই সকল কাহিনী আনুপূর্ব্বিক

বিবৃত করিলেন। অতঃপর বিনয়-মধুর-বাক্যে কহিলেন—"ঠাকুরাণি! আজ বৈষ্ণবসমাজ আমার পরীক্ষা করিবেন। ঠাকুর শ্রীহৃদয়চৈতন্য আজ্ঞা করিয়াছেন, "আমি যদি স্বপ্নাবেশে দুঃখী-কৃষ্ণদাসকে নাম ও তিলক দিয়া থাকি, তবে তিলক ধুইয়া ফেলিলে এবং বক্ষে শ্যামানন্দ নাম লিখিয়া মুছিয়া ফেলিলেও যদি সে তিলক ও নাম উজ্জ্বলরূপে পুনরায় ফুটিয়া উঠে, তাহা হইলে আমার কৃপা সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিব, নতুবা কৃষ্ণদাসকে বৈষ্ণব সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে।" দেবি! এই জন্যই বৈষ্ণব মহান্তগণ আজ সমাজ করিয়া আমার পরীক্ষা করিতেছেন। আমি দণ্ড দুই পরে বুঝিয়া কহিব বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আপনার অভয় পদারবিন্দের ছায়াতলে আসিয়া উপনীত হইয়াছি——

"কৃপা কর ঠাকুরাণী দেহ পদছায়া।
নিজ দাসী জানিয়া করহ মোরে দয়া॥
গুরুর চরণ পাই তোমার চরণ।
মহান্ত সমাজে মোরে কর উদ্ধারণ॥" শ্যাঃ প্রঃ।

শ্রীললিতা স্বীয় অনুদাসী কনকমঞ্জরীর প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিবার নিমিত্ত শ্রীমতিকে বিনয় অনুরোধ করিলেন। শ্রীরূপমঞ্জরীও বহু অনুনয় করিলেন। অনন্তর শ্রীললিতা কনকমঞ্জরীর করে ধরিয়া শ্রীমতির রাতুল চরণকমলপ্রান্তে ফেলিয়া দিলেন। শ্রীরাধা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে শ্রীপাদপদ্ম তুলিয়া দিয়া দাসী অঙ্গীকার করিলেন। পরে শ্রীসুবল সখাকে সখী দ্বারা আহ্বান করিয়া তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন—"তোমার দাসের দাস এই "কৃষ্ণদাস" আমার কুঞ্জ-সেবার অভিলাষী হইয়া আমার প্রতি তাহার প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে। আমিও তাহাকে দাসী অঙ্গীকার করিয়াছি। এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি বল?"

শ্রীসুবলচন্দ্র প্রফুল্ল অন্তরে বিনীত বাক্যে কহিলেন—"সে তো আমার পরম সৌভাগ্য!"——

"তব পদে দাসী হৈল মোর দাসগণে।
আমি বাঞ্ছি দাসী হৈতে তোমার চরণে॥" শ্যাঃ প্রঃ।

শ্রীসুবলের কথা শুনিয়া শ্রীরাধা মহা আনন্দিত হইলেন এবং শ্যামানন্দ যাহাতে পরীক্ষায় জয়লাভ করিতে পারেন তাহার উপায় করিতে বলিলেন। শ্যামানন্দ শ্রীসুবলচন্দ্রের চরণ ধরিয়া বহু প্রণাম করিলেন এবং নয়নজলে তাঁহার শ্রীচরণ-কমল পরিসিক্ত করিলেন। শ্রীসুবল, শ্যামানন্দকে শান্ত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার কপালে শ্রীরাধা-বল্লভী নামক শ্রীরাধাপদাকৃতি তিলক রচনা করিয়া ও হৃদয়দেশে "শ্যামানন্দ" নাম লিখিয়া দিলেন। আর বলিয়া দিলেন—"কৃষ্ণদাস! তুমি মহান্তসমাজে প্রকাশ করিবে যে, আমার অভীষ্টদেব শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর স্বরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর আসিয়া আমাকে কৃপা করিয়াছেন। মহান্তসমাজে আমার স্মরণ করিলেই তোমার তিলক ও নাম পুনঃপুন প্রকাশ পাইবে।"

শ্যামানন্দ এই অসামান্য কৃপা লাভ করিয়া প্রেমানন্দে পুলকিত হইলেন। শ্রীসুবলচন্দ্রের শ্রীচরণপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া বহু নতি-স্তুতি করিলেন। শ্রীসুবল শ্রীচরণকমলের শীতল স্পর্শদানে শ্যামানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃতার্থ করিলেন। অনন্তর শ্যামানন্দ শ্রীরাধা ও ললিতার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। যদিও প্রেমময়ীর অফুরন্ত আনন্দভরা প্রেমের রাজ্য হইতে, নিত্য পাপ-তাপ দুঃখ-জরাকীর্ণ সংসারধামে পুনরায় প্রবেশ করিতে তাঁহার প্রাণ-মন অতিমাত্র অধীর হইয়া উঠিল। দু'নয়ন বহিয়া শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অশ্রুধারা অবিরল ঝরিতে লাগিল। শ্রীমতি তাঁহাকে বহু প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া বিদায় দিলেন।

শ্যামানন্দ এইরূপে নিত্য-বৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসোহাগিনীর সুখদ নিকুঞ্জমন্দিরে অবস্থান করিয়া আনন্দলীলারসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। আর এদিকে প্রকট ভূ-বৃন্দাবনে মহান্তগণ শ্যামানন্দের স্থূলদেহ নিষ্পন্দ, নিশ্চেষ্ট, প্রাণহীন দর্শন করিয়া যার-পর-নাই বিস্মিত, স্তম্ভিত ও শোকাকুল হইয়া পড়িলেন।

শ্যামানন্দের ভাব-চেষ্টা শ্রীজীবের অবিদিত নহে। তিনি সকলকে সান্ত্বনা করিয়া শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে কহিলেন। তখন সকল মহান্তগণ মিলিয়া শ্যামানন্দের সেই চেতনা-বিহীন স্থূলদেহ বেষ্টন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে শ্যামানন্দের দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হইল। তিনি "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। তদ্দর্শনে সকলে মহানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তখন মহান্তগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলে শ্যামানন্দ কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিলেন——

"————শুন কহি এক কথা।
শ্রীপণ্ডিত ঠাকুর কৃপা করিলা সর্ব্বথা॥
গোঁসাঞির স্বরূপ হৈয়া দরশন দিলা।
শ্রীগৌরীদাস ঠাকুর মোরে কৃপা কৈলা॥
যদি আমি তাঁহার চরণে ভৃত্য হব।
এই নাম তিলক তাঁর প্রত্যক্ষ দেখাব॥" শ্যাঃ প্রঃ।

এই কথা শুনিয়া মহান্তগণ শ্যামানন্দের প্রশংসা করিয়া কহিলেন—কৃষ্ণদাস! সত্যই যদি শ্রীপণ্ডিত ঠাকুর তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, সে তো তোমার পরম সৌভাগ্য! এক্ষণে এই বৈষ্ণব-সমাজে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া সকলের সন্দেহ নিরসন কর।"

শ্যামানন্দ করযোড় করিয়া সভামধ্যে আনত বদনে উপবেশন করিলেন। ভক্তের মান যাহাতে রক্ষা পায়,

শ্রীগৌরাঙ্গের স্থানে কাতর প্রাণে কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মহান্তগণের অভিমতে স্বয়ং শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর শ্যামানন্দের ললাটের তিলক ও বক্ষের লিখিত নাম কম্পিত করে ধৌত করিয়া দিলেন। কিন্তু সে সময় ঠাকুরের হৃদয় যেন কি এক অজ্ঞাত ভাবের ভরে দুরু দুরু করিতে লাগিল।

দীনতারখনি শ্যামানন্দ ভক্তি বিগলিত-প্রাণে পণ্ডিত ঠাকুরকে পুনঃপুন স্মরণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ললাটের তিলক চিহ্ন ও হৃদয়ে শ্যামানন্দ নামাঙ্কন পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর রূপে উদ্ভাসিত হইল। যতবার ধৌত করিয়া দিলেন, ততবারই উত্তরোত্তর উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া মহান্তগণ বিস্ময়ে ও পুলকানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ঠাকুর হৃদয়ানন্দ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তখন কেহ শ্যামানন্দকে কোলে করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিলেন, কেহ স্নেহবশে বদন চুম্বন করিতে লাগিলেন, কেহ আশীর্ব্বাদ, কেহ দণ্ডবৎ, কেহ বা শ্যামানন্দের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তখন সমগ্র বৃন্দাবন ব্যাপিয়া কি যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। শ্যামানন্দ সকল বৈষ্ণব মহান্তের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং ঠাকুর শ্রীহৃদয়চৈতন্যের চরণে প্রণাম করিতে, তিনি কি করিলেন?——

"গোঁসাই, করিয়া কোলে গলায় বান্ধিলা।
মুখ চুম্বন করি কোলে বসাইলা॥" শ্যাঃ প্রঃ।

সমবেত বৈষ্ণব মহান্তগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। শ্রীহৃদয়ানন্দ ঠাকুরের অনুসঙ্গী বৈষ্ণব মহোদয়গণও স্নান, পূজা ও ভোজনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। শ্রীজীব শ্যামানন্দ

বাষ্প-গদ্‌গদ-কণ্ঠে শ্যামানন্দকে কোলে লইয়া কহিলেন—"শ্যামানন্দ! আজ আমি ধন্য হইলাম। তুমি যে শ্রীরাধার প্রাণাধিক প্রিয় ভক্ত, তাহা আজ জগদ্বাসী দেখিয়া ধন্য হইল। ভক্তের মহিমা কিরূপ অলৌকিক তাহা আজ সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন। যাহা হউক বৎস! তুমি এক্ষণে শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের নিকট যাইয়া তাঁহার চরণ সেবা কর গে।"

শ্যামানন্দ সেই মুহূর্ত্তে শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের সমীপে গমন করিলেন এবং যাহাতে তাঁহার সেবায় কোনরূপ ত্রুটী না হয় তাহার প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। পরদিন শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভু শ্যামানন্দকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীব্রজ-পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। একে একে দ্বাদশবন যত উপবন এবং সমস্ত কুঞ্জ, কুঞ্জ-ভবনাদি প্রেমোল্লাসভরে দর্শন করিতে লাগিলেন। চির প্রেমময় ব্রজধামের অনন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভার দর্শন করিয়া তাঁহাদের হৃদয় এক অব্যক্ত ভাবরাশিতে ভরিয়া গেল। বাস্তবিকই তাঁহারা তখন অপার্থিব আনন্দতরঙ্গে ভাসমান হইলেন। এক একটী লীলাস্থান দর্শন করেন, অমনই সেই সেই লীলার ভাব উদ্দীপিত হইয়া তাঁহাদিগকে ভাবরাশিতে নিমগ্ন করিয়া ফেলে, তাঁহাদের প্রাণমন প্রেম পুলকে নৃত্য করিতে থাকে।

রাসোৎসবের দিন! ব্রজবাসী ভক্তমাত্রেই প্রেমোল্লাসে আত্মহারা। সকলেই সে শ্রীরাসানন্দ-ব্যাপার দর্শন করিতে গমন করিলেন। শিষ্য-সেবক সমভিব্যাহারে ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যও গমন করিলেন। শ্যামানন্দও সঙ্গে যাইলেন। শ্যামানন্দ শ্রীরাসমণ্ডলে উপনীত হইয়া প্রেমাঞ্জন-রঞ্জিত দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন—"শ্রীরাধাশ্যাম পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া ভুবনমোহন ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছেন'। ত্রিভুবনেও

ললিতাদি সখীগণ শ্রীরাধাশ্যামের গুণগাথা সুধাসিক্ত কম-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্যামানন্দ তাহা দর্শন করিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং আবেগভরা গদ্গদকণ্ঠে “রাধা রাধা” বলিয়া ভূমিতলে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। প্রেমাশ্রুর পীযুষ-প্রবাহে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি সহসা গাত্রোত্থান করিয়া গোপীভাব প্রকাশ করিলেন—মস্তকে স্ত্রীলোকের ন্যায় অবগুণ্ঠন দিয়া পুলকানন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন। শাস্ত্রে এই গুণময়দেহকে অন্তশ্চিন্তিত অভীষ্ট সখীর অনুগাভাবে সাজাইবার বিধি, দৃষ্ট না হইলেও অর্থাৎ এই যথাবিহিত পুরুষ দেহকে ধ্যানগম্যা ব্রজ-গোপিনীর ন্যায় স্ত্রীলোকের বেশভূষায় অলঙ্কৃত করিবার বিধি না থাকিলেও শ্যামানন্দের ন্যায় কৃপাসিদ্ধ ভক্তের পক্ষে কোন দোষাবহ হয় নাই। শ্যামানন্দ প্রেমের চক্ষে শ্রীরাসোৎসব দর্শন করিতে করিতে আনন্দ-চিন্ময়-রস-পরিভাবিতা শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তিতে গোপীভাবে একান্ত তন্ময় হইয়াছেন। সিদ্ধ ও সাধকভাবের পরৈক্যে তাঁহার অন্তর-বাহ্য ভেদভাব একবারে নিরস্ত হইয়া গিয়াছে। তাই, সেই প্রবল ভাব-তরঙ্গে বিবশ হইয়া ঠাকুর শ্যামানন্দ এইরূপ গোপীবেশ প্রকাশ করিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যবিধ কারণ থাকাও সম্ভব হইতে পারে। বোধ হয়, তিনি যে সখ্যভাব পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে ভাবের চরম গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীরাধার অনুসঙ্গিনী হইয়াছেন শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরকে তাহা বিদিত করিবার জন্যই এইরূপ ভাব-চেষ্টা প্রকটিত করিলেন।

যাহা হউক শ্যামানন্দের এই গোপীভাব দর্শন করিয়া ঠাকুর হৃদয়-চৈতন্য যার-পর-নাই দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। ভাবিলেন—“শ্যামানন্দ শ্রীকৃষ্ণের ভাব পরিত্যাগ করিয়া যখন শ্রীরাধার ভাবের অনুগ হইয়াছে তখন সে তো আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। তবে আর শ্যামানন্দের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ?”

এই ভাবিয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য ক্ষুণ্ণমনে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। রাসোৎসব পূর্ণ হইল, মহান্তগণও স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষেই শ্যামানন্দ শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের পদপ্রান্তে আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন——

"ক্রোধ করিয়া গোসাঞি কহিতে লাগিলা।
আমার কৃষ্ণের সঙ্গে ভাব ছাড়ি দিলা॥
গোপীভাব হৈল তোর গোপীর লক্ষণ।
আর তোর সঙ্গে মোর কোন্ প্রয়োজন॥" শ্যাঃ প্রঃ।

এই কথা শুনিয়া শ্যামানন্দ কান্দিতে কান্দিতে করযোড় করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন—"প্রভো! স্বয়ং পণ্ডিত ঠাকুরও তো ভাব গ্রহণ করিয়াছেন——

"কৃষ্ণ সঙ্গে রহে রাধাভাব অনুক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ দোহাকার করান মিলন॥
রাধাকৃষ্ণ কার্য্যেতে থাকিয়া সেইক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ-বিলাস, কুঞ্জে করেন দর্শন॥ *

---

* যথা উজ্জ্বল নীলমণৌ—

প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়া কলি প্রস্থিতাং
শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাং।
খিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং
ক্ব শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি॥

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতই ব্রজলীলায় শ্রীসুবল সখা। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কলহ করিয়া প্রস্থান করিলে শ্রীসুবল গিয়া বিবিধ বিনয় বাক্যে প্রসন্ন করিয়া প্রত্যানয়ন করেন এবং কুঞ্জগৃহে অপূর্ব্ব কন্দর্পলীলোচিত শয্যা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আর যখন অঘরিপু শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পযুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া প্রেয়সীর হৃদয়োপরি স্রস্তাঙ্গ হন তখন ঐ শ্রীসুবল চামর গ্রহণ পূর্ব্বক বীজন করিতে আরম্ভ

সেই সঙ্গে মোর ভাব হৈল উদ্দীপন।
কেমনে ছাড়িল প্রভু তোমার চরণ॥
রাধা-বেশ হৈল কুঞ্জে সুবল ঠাকুর।
তাঁর ভাবে আস্বাদন করেন মধুর॥" শ্যাঃ প্রঃ।

শ্যামানন্দের কথায় ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের ক্রোধ আরও বাড়িয়া উঠিল। নয়ন আরক্ত করিয়া কহিলেন—"মিথ্যা কথা! একদিনের জন্যও শ্রীপণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীমুখে এমন কথা শুনি নাই তো? অতএব শুন, শ্যামানন্দ! সখ্যভাব ত্যাগ করিয়া কদাচ সখীভাব আচরণ করিও না।"

এই আদেশ বাক্য শুনিয়া শ্যামানন্দ বজ্রাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন—"প্রভো! দাসকে ক্ষমা করুন, এই কৃপাপ্রাপ্ত ভাব-সার কিরূপে ত্যাগ করিতে পারি?"

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া শ্যামানন্দের পৃষ্ঠদেশে কঠিন চপেটাঘাত করিলেন। তাহাতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ হওয়ায় রুধিরধারা ঝরিতে লাগিল। মহান্তগণ ছুটিয়া আসিয়া ঠাকুরের হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং শ্যামানন্দকে ঠাকুরের কিঞ্চিৎ অন্তরালে লইয়া গিয়া নানাপ্রকার বাক্যে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্যামানন্দ তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না। বরং "শ্রীগুরুর কৃপা হইল" বলিয়া মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দের সেই অপূর্ব্ব ভাব-পারিপাট্য দর্শন করিয়া ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য ও বৈষ্ণব মহান্তগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর শ্যামানন্দ ঠাকুরের চরণ ধরিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন—"প্রভো! আপনার পাঁচটী পুত্র, না হয়, তাহার পর একটী কন্যা সন্তানই হইল, এইরূপ

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য এই কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে শ্যামানন্দকে কোলে লইয়া বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহাকে যে প্রহার করিয়াছেন তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দ পরম প্রীতচিত্তে কহিলেন—"প্রভো! সে প্রহার নহে, দুর্লভ কৃপামৃত বর্ষণ। আমি ইহাতে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।"

ঠাকুর, শ্যামানন্দকে বহু আশীর্ব্বাদ করিলেন। শ্যামানন্দ বিদায় লইয়া শ্রীজীবের কুটীরে গমন করিলেন।

ঠিক এই ঘটনার দিনই রাত্রিতে ঠাকুর নিদ্রিতাবস্থায় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিলেন। দেখিলেন—"ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান্ তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার শুভ্র উত্তরীয় বসন শোণিতে অভিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীহৃদয়চৈতন্য বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু কহিলেন——

"তোর কৃপা হৈতে হয় এ রক্তবসন।
শ্যামানন্দ মোর আত্মা, করিলি যাতন॥
তাহারে মারিতে মোর অঙ্গেতে বাজিলা।
রক্তেতে বসন মোর ডুবিয়া রহিলা॥" শ্যাঃ প্রঃ।

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কাতরপ্রাণে পুনঃপুন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন—"হে ভক্তের জীবন! হে দয়াময়! শ্যামানন্দ যে আপনার দ্বিতীয় স্বরূপ মূর্ত্তি তাহা এতদিন জানিতাম না। ভক্ত যে ভগবানের অভিন্ন তনু তাহা আজ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। কিন্তু হে নাথ! আমি ভক্তদ্রোহী, ত্রিভুবনেও আমার আর নিস্তার নাই। ভক্তের চরণে আর ভক্তের ভগবান যে আপনি, প্রভু হে! আপনার চরণে যে মহান্ অপরাধ করিয়াছি, তাহা নিজ অপার করুণাগুণে ক্ষমা করুন। পাপী-

অকাতরে কৃপা বিতরণ করিবার নিমিত্তই আপনার এই সর্ব্বাবতারসার শ্রীগৌরাবতার! তাই কাতরে প্রার্থনা করি, দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।”

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের এইরূপ আর্ত্তিনিবেদনে শ্রীগৌরহরি পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন—“বৎস! আমার স্থানে যে অপরাধ, তাহা আমি আহ্লাদের সহিত ক্ষমা করিতেছি। কিন্তু আমার ভক্তের স্থানে যে অপরাধ তাহা আমার অপেক্ষাও অধিক! ভক্তের তুষ্টি বিধানই এই অপরাধ মোচনের উপায়। অতএব শ্যামানন্দকে শান্ত করিয়া দ্বাদশ-দিন-ব্যাপী মহোৎসব কর, তবে তোমার এই অপরাধের মোচন হইবে।”

এই বলিয়া ভক্তবৎসল শ্রীগৌরভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যেরও নিদ্রাবেশ তিরোহিত হইল। তিনি “শ্রীগৌরগোবিন্দ” স্মরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। স্বপ্ন-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে তড়িদ্বর্ণে অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি সেই স্বপ্নের বৃত্তান্ত যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন আশঙ্কা ও উদ্বেগ-ঝটিকায় তাঁহার প্রাণমন ততই বিক্ষুব্ধ ও কম্পিত হইতে লাগিল। প্রভাত হইবামাত্র তিনি বৈষ্ণব মহান্তগণের স্থানে সেই আশ্চর্য্য স্বপ্নকাহিনী বিবৃত করিলেন। মহান্তগণ তাহা শুনিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, স্বপ্ন অমূলক বটে, কিন্তু শ্যামানন্দের স্বপ্নে কৃপালাভ যখন সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন শ্যামানন্দ-সংক্রান্ত এই স্বপ্ন-কাহিনীও সত্য। অতএব দ্বাদশ মহোৎসব অবশ্যই করিতে হইবে।”

এইরূপে সাধুসমাজের বিচারে ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য দ্বাদশ মহোৎসব রূপ দণ্ডের দায়ী হইলেন দেখিয়া শ্যামানন্দ সেই সাধুসমাজের প্রতি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন——

“প্রভু সনে কৈলুঁ বাদ মোর অপরাধ।

দ্বাদশ মহোৎসব এই মোরে ভিক্ষা দেহ।
সভে কৃপা করি মোরে আপন করি লেহ॥" শ্যাঃ প্রঃ।

শ্যামানন্দ মস্তক পাতিয়া শ্রীগুরুর সকল অপরাধ গ্রহণ করিলেন দেখিয়া বৈষ্ণব মহান্তগণ পরমানন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ধন্য শ্যামানন্দ! তোমার যশোগানে আজ বিশ্ব ভরিয়া গেল। ধন্য তোমার সাধন সুকৃতি! তুমি নিজেও উদ্ধার হইলে আবার শ্রীগুরুদেবেরও উদ্ধার সাধন করিলে। তুমি কখনই ভক্ত নও—ভক্তবেশে ভগবানের অবতার। তোমার দর্শন লাভ করিয়া আমরা কৃতার্থ ও পবিত্র হইলাম।"

মহান্তগণ এইরূপ নানাপ্রকার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীহৃদয়ানন্দ ঠাকুর শ্যামানন্দকে গাঢ় স্নেহালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া প্রেমাশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহান্তগণ পরামর্শ করিয়া শ্যামানন্দকে মহোৎসবের আয়োজন করিতে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, তাঁহারা শ্রীব্রজ-পরিক্রমা করিয়া শীঘ্রই মহোৎসবানন্দে যোগদান করিবেন।

শ্যামানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে শ্রীজীবের নিকটে উপনীত হইলেন এবং শ্রীজীবকে সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শ্রীজীব তাহা শ্রবণ করিয়া আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে মহোৎসবের আয়োজনে মনোযোগী হইলেন। শ্যামানন্দদেবের মহোৎসব শুনিয়া ব্রজবাসী মাত্রেই ভাণ্ডারে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিলেন। ক্রমে ব্রজ ও মথুরা হইতেও বহুতর ভিক্ষা সংগৃহীত হইল। ভাণ্ডার নানাবিধ দ্রব্যজাতে পূর্ণ হইয়া গেল। এত সামগ্রী যে দ্বাদশ মহোৎসবের স্থলে চতুর্ব্বিংশ মহোৎসব হইলেও কোন দ্রব্যের অভাব হইবে না। ফলতঃ মহোৎসবের উপযোগী দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইল। যথা-

শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। মহোৎসবের আনন্দতরঙ্গ পূর্ণ মাত্রায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। তখন শ্যামানন্দ অত্যন্ত কাতরভাবে শ্রীজীবের চরণে নিবেদন করিলেন—"প্রভো! আমি কিছুই জানি না। আপনি যে আজ্ঞা করিবেন, আমি সেই কার্য্যই করিব; আপনিই এই মহোৎসবের অধিকারী।"

শ্রীজীব সন্তুষ্টচিত্তে শ্যামানন্দের মহোৎসবের ভার গ্রহণ করিয়া স্বীয় সেবকগণকে ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ করিলেন। সমস্ত ব্রজবাসী ও সাধু সন্ন্যাসীভক্তগণকে নিমন্ত্রণ করা হইল। দ্বিতীয়ায় মহোৎসবের শুভ-অধিবাস করিয়া পূর্ণিমায় উদ্‌যাপন করা হইল। এই কয়দিন যে কিরূপ অনাবিল আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা প্রকৃতই দুঃসাধ্য। সে আনন্দের কীর্ত্তন, আনন্দের ভোজন, আনন্দের আলাপন, আর সেই সঙ্গে প্রেমানন্দের পুলকাশ্রু বর্ষণ সকলই অপূর্ব্ব, সকলই অপার্থিব! চাতুর্ব্বিধ ভক্ষ্যদ্রব্য পর্ব্বত প্রমাণ প্রস্তুত হইতে লাগিল, শত শত ব্যক্তি পরিতৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিতে লাগিলেন। কত শত লোক কত দ্রব্য বোঝা বান্ধিয়া লইয়া গেল। এইরূপ এক পক্ষকাল মহোৎসব। অনন্তর পূর্ণিমার দিন রাসোৎসব সম্পন্ন করিয়া পূজারী, সাধু মহান্ত প্রভৃতিকে বিদায় দিলেন। স্বগণ সহিত শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া গৌড়দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্যামানন্দ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত আসিলেন। তদ্দর্শনে ঠাকুর, শ্যামানন্দকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। শ্যামানন্দ শ্রীগুরুর পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া রোদন করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন এবং শ্রীজীবের নিকট আসিয়া পূর্ব্ববৎ সাধন ভজন ও ভক্তিগ্রন্থাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—*—

গৌড়যাত্রা।

শ্রীরাসোৎসব উপলক্ষে শ্রীজীব গোস্বামীর কুটীর-প্রাঙ্গনে বৃন্দাবন বাসী প্রায় সকল ভক্তগণই সম্মিলিত হইয়াছেন। বিবিধ ভক্তি-কথা আলোচনার পর শ্রীজীব গোস্বামী প্রস্তাব করিলেন—"প্রভুর কৃপাশক্তি প্রেরণায় শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণ দ্বারা জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত বহুতর ভক্তিগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এক্ষণে সে সকল গ্রন্থ-রত্ন কিরূপে প্রচারিত হইবে আপনারা তাহার উপায় করুন। বিশেষতঃ—

"অন্তদেশ হৈতে প্রভুর নিজাত্মা গৌড়দেশ।
সর্ব্ব মহান্তের বাস অশেষ বিশেষ॥
এই ধর্ম্ম প্রকট হয়, গ্রন্থ পরচার।
যেমনে হয়েন তার করহ প্রকার॥ প্রেঃ বিঃ।

শ্রীজীবের এই সাধু-প্রস্তাব, সকলে আনন্দের সহিত অনুমোদন করিলেন। বলিলেন—"গোসাঞি! এই শুভ কার্য্য যাহাতে শীঘ্র সুসম্পন্ন হয়, আপনি তাহার উপায় করুন। আমরা যথাসাধ্য আপনার সহায়তা করিব।"

শ্রীজীব বলিলেন—"এই প্রচার-কার্য্যে শ্রীনিবাস আচার্য্যকেই সর্ব্বোত্তোভাবে উপযুক্ত দেখিতেছি। প্রভুর ধর্ম্ম ও শ্রীগ্রন্থ প্রচারের জন্ত শ্রীনিবাসকেই গৌড়দেশে পাঠাইব এবং তাহার সঙ্গে নরোত্তম ও শ্যামানন্দও থাকিবে।"

শ্রীনিবাস, শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর শিষ্য, নরোত্তম শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য ; তাঁহারা প্রিয়তম শিষ্যদ্বয়ের স্নেহে কাতর হইয়াও প্রভুর প্রিয় কার্য্য সাধনের জন্য উভয়কে গৌড়গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম, গোস্বামীদ্বয়ের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে বিনীত ভাবে কহিলেন—'প্রভো! এই আজ্ঞা করুন, আমরা শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া চিরদিন আপনাদের চরণ সেবা করি ; তদ্ভিন্ন আমাদের মনের অন্য কোন অভিলাষ নাই।" উভয়ের এইরূপ কাতরতা দর্শন করিয়া তখন সকলে বুঝাইয়া বলিলেন—

"বড় ধর্ম্ম রক্ষা—প্রভু-ধর্ম্ম প্রচারণ।
সবার আজ্ঞায় গৌড় করহ গমন॥" প্রেঃ বিঃ।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। অবনত-মস্তকে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। শ্রীভট্টগোস্বামী শ্রীনিবাসের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বহুশক্তি সঞ্চারণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকের চরণে প্রণাম করিয়া কৃপা ভিক্ষা চাহিলেন। মহান্তগণ সকলেই কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের জীবন স্বরূপ। তাঁহাদের গৌড়গমনের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সকলে অধীর হইয়া পড়িলেন। যথা—

"এই কথা সর্ব্বত্রই হইল প্রকাশ।
গ্রন্থ লৈয়া গৌড়ে যাইবেন শ্রীনিবাস॥
গ্রন্থরত্ন প্রদান করিবে স্থানে স্থানে।
গমন হইবে শুক্লপক্ষ অগ্রহায়ণে॥
শ্রীনিবাস হেথা হৈতে করিলে গমন।
কিরূপে ধরিবে ধৈর্য্য প্রভুপ্রিয় গণ॥

মো সবার অন্তর কিরূপে হবে স্থির।
এত কহিতেই নেত্রে বহে প্রেম-নীর॥" ভঃ রঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই; কিন্তু তিনি যে প্রেমের ধর্ম্ম জগতের জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা শ্রীরূপ সনাতনাদি দ্বারা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সে সমুদয় ভক্তিগ্রন্থ এতদিন শ্রীবৃন্দাবনেই নিবদ্ধ ছিল। গৌড়বাসী ভক্তগণ তাহার মর্ম্মরসাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ ছিলেন। এক্ষণে শ্রীনিবাস আচার্য্য দ্বারা তাঁহাদের সে অভাব ও মনঃ ক্ষোভ দূরীভূত হইবার উপক্রম হইল। এই ভক্তিগ্রন্থ রচনা যেমন প্রভুর এক মহীয়সী শক্তির নিদর্শন, সেইরূপ এই ভক্তিগ্রন্থ প্রচারও প্রভুর এক অচিন্ত্য শক্তির বিকাশ! শ্রীজীব অন্যান্য মহান্তগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাপঞ্চমীই গৌড় যাত্রার প্রশস্ত দিনস্থির করিলেন।

মথুরা নগরে এক ধনী মহাজন শ্রীজীব গোস্বামীর সেবক ছিলেন। শ্রীজীব তাঁহাকে স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহাজন পত্র পাইবামাত্র শ্রীজীবের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীব, তাঁহাকে সকল কথাই বলিলেন। অনন্তর সেই ভক্তিগ্রন্থ সমূহ বহিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুইটী গো-শকট চারিটী বলদ, কয়েকটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুক এবং গাড়ী রক্ষণাবেক্ষণ করিতে দশজন সশস্ত্র রক্ষীর বন্দোবস্ত করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। মহাজন আনন্দের সহিত তাহাতে সম্মতি জানাইলেন এবং দশদিন পরে সমস্তই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন বলিয়া গোস্বামীর নিকট বিদায় হইলেন।

নির্দ্দিষ্টদিনে গাড়ী, সিন্দুক, লোকজন সমস্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, হরিভক্তিবিলাস, সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা, ভাগবতামৃত, সনাতন গীতা, ষট্‌সন্দর্ভ, স্তবাবলী, ও কবিরাজ

গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ইত্যাদি যে সমস্ত শ্রীগ্রন্থ বৃন্দাবনে রচিত হইয়াছিলেন সমুদয়ই স্তরে স্তরে সিন্ধুকে সাজান হইল। শেষে মোমজামা দিয়া আবৃত করা হইল।

শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ একে একে ব্রজবাসী সকল ভক্তগণের নিকটই বিদায় লইলেন। সকলেই স্নেহাশ্রু-প্লুতলোচনে বিদায়-আশীর্ব্বাদ করিলেন। নির্দ্দিষ্টদিনে শ্রীগোবিন্দজীউর প্রাঙ্গনে সকলে সমবেত হইলেন। গ্রন্থপূর্ণ সিন্ধুক গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। শ্রীজীব, শ্রীগোবিন্দজীউর চরণে শ্রীনিবাসাদির জন্য গ্রন্থপ্রচারশক্তি প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনামাত্র শ্রীগোবিন্দজীর কণ্ঠের পুষ্পমালা ছিন্ন হইয়া পড়িল। পূজারী শশব্যস্তে সেই প্রসাদী মালা তুলিয়া লইয়া শ্রীজীবের হস্তে প্রদান করিলেন। শ্রীজীব, তাহা শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন।

গাড়ী সজ্জিত হইল। শ্রীজীব, শ্রীনিবাসের মুখের দিকে স্নেহাশ্রুপূর্ণ লোচনে চাহিয়া মৃদুভাবে কহিলেন—"শ্রীনিবাস! এখন যে সকল গ্রন্থ পাঠাইতে পারিলাম না, পরে তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইব। আরও নূতন যাহা রচিত হইবে তাহাও পাঠাইব।"

গোস্বামী ও মহান্তগণের সম্মতিক্রমে শুভক্ষণে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইল। গাড়ী মথুরার পথে ধীরে ধীরে চলিল।

"শুভক্ষণে গাড়ী চালাইলা গাড়োয়ান।
আগে পাছে চলে পদাতিক ভাগ্যবান্॥
আর এক লোক, যোগ্য সর্ব্ব প্রকারেতে।
অতি সাবধানে চলে গাড়ীর সঙ্গেতে॥
এইরূপে গাড়ী চলে মথুরার পথে।
কতোদূর সকল গোস্বামী চলে সাথে॥" ভঃ রঃ।

গোস্বামিগণ ব্যাকুল প্রাণে সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। অবশেষে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে অতিকষ্টে আপন আপন বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কেবল শ্রীজীবাদি কয়েক জন বিশিষ্ট ভক্ত সঙ্গে সঙ্গে মথুরা পর্য্যন্ত গমন করিলেন। মথুরাবাসী ভক্তগণ এই ঘটনা অবলোকন করিয়া যার-পর-নাই সুখী হইলেন। সেই রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া বিদায়ের কালে, শ্রীজীব নরোত্তমকে ডাকিয়া বলিলেন—

"শুন নরোত্তম তোমায় কহি এক কথা।
এই শ্যামানন্দ ছিলা মোর স্থানে হেথা॥
ইহারে ত লৈয়া যাহ কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।
নিজদেশে পাঠাইবা লোক দিয়া সঙ্গে॥
খরচ সহিত দিবে দুঃখ নাহি পায়।
সর্ব্বভাবে করিবেক ইহার সহায়"॥ প্রেঃ বিঃ।

অনন্তর শ্যামানন্দের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—

"শুন শুন শ্যামানন্দ আমার বচন।
এই নরোত্তম হ'ল আমার জীবন॥
আমাকে জানিহ যেমন ইহাকে জানিবে।
ভজন প্রসঙ্গ কথা ইহারে জিজ্ঞাসিবে॥
ভয়ে কিছু আমারে না কর প্রশ্ন আর।
তাহা জিজ্ঞাসিবে মনে আছয়ে তোমার॥
কিম্বা সাধনাঙ্গ আর সিদ্ধদেহ কথা।
নিগূঢ় প্রসঙ্গ যত কহিবে সর্ব্বথা॥ প্রেঃ বিঃ॥

এই বলিয়া শ্রীজীব, নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত—অঙ্গ পুলক-পূরিত। শ্রীজীব বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন—

"—এ দুই তোমার।
সর্ব্ব মতে তোমারে সে এ দোঁহার ভার॥" নঃ বিঃ।

অনন্তর বিদায়ের কালে সকলকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"এই ধর্ম্ম-প্রচার ও ভক্তিগ্রন্থ-প্রকাশ আমার আজ্ঞা নহে, সর্ব্বেব প্রভুর আদেশ জানিবে। অতএব শীঘ্র প্রভুর ইচ্ছায় তোমাদের গৌড়-গমন নিরাপদে সম্পন্ন হউক। প্রভু তোমাদের মঙ্গল করুন।"

এই বলিয়া শ্রীজীব, শ্রীনিবাসের হস্ত ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে স্নেহ-বিজড়িত-কণ্ঠে বলিলেন—"বৎস! তোমাদের মহিমাগুণে আমি এমনই মোহিত হইয়াছি যে, জীবনে-মরণে তোমাদিগকে কখনই ভুলিতে পারিব না। তোমাদের স্নেহ-কোমল-মূর্ত্তি আমার হৃদয়-পটে চির অঙ্কিত হইয়া থাকিবে।"

অনন্তর শ্যামানন্দের কর ধারণ করিয়া বলিলেন—"বৎস!—

"দেশে যাই কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবন।
ধর্ম্ম প্রচারণ কর প্রেম প্রবর্ত্তন॥
দেশে যাহ চিন্তা নাই সর্ব্বত্র মঙ্গল।
তোমার যে শাখা দ্বারে ভাসিবে সকল॥
* * * *
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি তাহে দিবে মন।"
নরোত্তমের হাতে ধরি কৈল সমর্পণ॥ প্রেঃ বিঃ।

শ্রীজীব পুনরায় নরোত্তমকে বলিলেন—"দেখ বাপু! আমি শ্যামানন্দকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম। তুমি দুই জন লোক ও খরচ দিয়া সত্বর ইহাকে দেশে পাঠাইয়া দিবে, যেন কোন প্রকারে কষ্ট না পায় সে বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থা করিবে।"

শ্যামানন্দ শ্রীজীবের পদ-যুগল ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্রীজীব তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া বহু সান্ত্বনা করিলেন। তখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রাঘব পণ্ডিত, শ্রীগোপাল, মাধবাদি ভক্তগণ সকলেই মহা অধৈর্য্য হইলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য প্রণাম সম্ভাষণ করিয়া রোদন করিতে করিতে বিদায় হইলেন। গাড়ী রক্ষী-বেষ্টিত হইয়া অগ্রে অগ্রে চলিল, আর আচার্য্য প্রভু, ঠাকুর মহাশয়, ও শ্যামানন্দ কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে বিভোর হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। শ্রীজীব এইরূপে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মথুরার মহাজন একখানি রাজকীয় ছাড়-পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া তাঁহারা নিরাপদে রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। রাজ-পত্র দেখাইবার তাৎপর্য্য এই যে, তখন স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল। এরূপ সিন্ধুক বোঝাই গাড়ী ও সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী দেখিলে রাজ-পুরুষেরা পাছে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত করে, এইজন্যই রাজকীয় ছাড়-পত্র সঙ্গে লইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহারা ইটোয়া নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথা হইতে রাজ-পথ পরিত্যাগ করিয়া বনভূমির মধ্য দিয়া ঝারিখণ্ডের পথে যাইতে মনস্থ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই ঝারিখণ্ডের পথেই শ্রীবৃন্দাবন গমনাগমন করিতেন। তাঁহারা সেই পূর্ব্ব-স্মৃতি স্মরণ করিতে করিতে সেই পথ দিয়াই গমন করিতে লাগিলেন। অনেক নীলাচল-যাত্রীও তাঁহাদের সঙ্গী হইল।—

"নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া।
সে সভার সঙ্গে চলে বন পথ দিয়া॥
বিশেষ শ্রীচৈতন্যের যে পথে গমন।
যেই পথে নীলাচলে গেলা সনাতন॥

স্থানে স্থানে প্রভু ভৃত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিয়া।
দেখয়ে সে সব স্থান অধৈর্য্য হইয়া॥
বন পথে চলিতে আনন্দ অতিশয়।
কোন দিন কোথাও না হয় কোন ভয়॥" ভঃ রঃ

বন-পথের শোভা কি মনোহর! উভয় পার্শ্বে নিবিড় শ্যাম-বিটপী, পুষ্পিত লতা-কুঞ্জ, কুঞ্জে কুঞ্জে বিহঙ্গের কল-কূজন, পুষ্পে পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জন, কোথাও বা ময়ূর ময়ূরীর চারু-নর্ত্তন, ক্বচিৎ কোন পর্ব্বতের পাদ-পীঠে কুরঙ্গের উল্লাস-উল্লম্ফন, কোথাও ঝঙ্কৃতিময়ী নির্ঝরিণী, কোথাও বা কুলু-কুলু-নাদিনী স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতস্বিনী। তাঁহারা প্রকৃতির সেই চারু সুষমারাশি দর্শন করিতে করিতে পরম সুখে গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে আত্মহারা; পথক্লেশ আদৌ অনুভব করিতে পারিলেন না। বরং—

"কোকিল ময়ূর ডাকে নৃত্য করে তারা।
তাহা দেখি ভাব উঠে বৃন্দাবন পারা॥
মহাপ্রভু ঝারিখণ্ডে সুখ পাইল অতি।
দেখি অশ্রু কম্প হয় পুলকের পাঁতি॥
পরম আনন্দ সুখ, দুঃখ নাহি জানে।
ভদ্রাভদ্র হবে বলি নাহি পড়ে মনে॥" প্রেঃ বিঃ।

এইরূপে তাঁহারা পঞ্চকোট পর্য্যন্ত আসিয়া বিষ্ণুপুর রাজ্যের সীমায় পদার্পণ করিলেন। তখন বিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীর নামে এক দুর্দ্দান্ত মল্লবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। যে সময়ে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ অত্যাচারী পাঠানদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে আগমন করেন, সেই সময় এই বীরহাম্বীর পাঠানদিগের হস্ত হইতে জগৎসিংহকে উদ্ধার করেন। ইনি বিষ্ণুপুর রাজবংশের ৪৮শ রাজা।

তাঁহার বীরত্ব ও অলৌকিক ধর্ম্মকাহিনী এখনও বাঁকুড়া অঞ্চলে জ্বলন্ত-রূপে বর্ত্তমান। ইনিই দুর্গের চারিদিকে কামান বসাইয়া দুর্গটীকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। বীরহাম্বীর দস্যুদলের রাজা। তিনি দস্যুবৃত্তি করিবার জন্য বহুতর ডাকাইতের দল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া ছদ্মবেশে কি প্রকাশ্যভাবে যেরূপে সুবিধা হইত লুটপাট করিয়া দ্রব্যজাত রাজভাণ্ডারে উপস্থিত করিত। কে কোথায় দিয়া লুকাইয়া ধনরত্ন লইয়া যাইতেছে দৈবজ্ঞ দ্বারা গণনা করিয়া রাজা তাহা আনিবার জন্য দস্যুদল পাঠাইতেন। গ্রন্থ-পূর্ণ সিন্ধুক বোঝাই গাড়ী আর তৎসঙ্গে সশস্ত্র প্রহরী দেখিয়া দস্যুগণ বিস্তর ধনরত্ন পাইবার লোভে বহুদূর হইতে গাড়ীর সঙ্গ লইয়াছিল। গাড়ী রঘুনাথপুরের নিকট মালিয়াড়া গ্রামে উপনীত হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে; সকলে সেইগ্রামে এক ভৌমিকের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিলেন।

"পঞ্চকোট বামে রাখি রঘুনাথপুর।
নিজদেশ বলি বাড়ে আনন্দ প্রচুর॥
মালিয়াড়া বলিগ্রামে ভৌমিক এক হয়।
স্বচ্ছন্দে রহিলা তাঁহা হইয়া নির্ভয়॥" প্রেঃ বিঃ!

দস্যুগণ তাঁহাদিগের গাড়ীতে কি যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা গাড়ী বহুমূল্যরত্নপূর্ণ বলিয়া উত্তর করেন! দস্যুগণের আনন্দের পরিসীমা নাই। সেইদণ্ডেই তাহারা রাজা বীরহাম্বীরকে সংবাদ দিল। রাজা সংবাদ দাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সঙ্গে কত লোক?" দস্যু বলিল—"সবে মাত্র পনের জন।" রাজা বলিলেন—

"দুইশত লোক লইয়া করহ গমন।
প্রাণে নাহি মারিবে, আনিবে সব ধন॥" প্রেঃ বিঃ॥

গাড়ী গোপালপুরে আসিয়া পঁহুছিল। শ্রীনিবাসাদি সকলে তথায়

রজনী বাস করিবার মনস্থ করিলেন। দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-কথা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিয়া, কেহ কেহ শয়ন করিয়াছেন। কেহ বা তখনও বসিয়া আছেন। এমন সময়ে দস্যুগণ 'মারমার কাট কাট' শব্দে গাড়ী আক্রমণ করিল। কেহ কিছুই করিতে পারিলেন না। সকলেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। দস্যুগণ গাড়ী টানিয়া লইয়া বন পথে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। দস্যুগণ পথিমধ্যে অনেকস্থানে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।—

"তামড় গ্রামের সন্নিধানে সজ্জ হৈলা।
তথা নিজ কার্য্য সিদ্ধি করিতে নারিলা॥
রঘুনাথপুরের নিকটে নিশাভাগে।
হৈলা পরাভব সবে সে সবার আগে॥" ভঃ রঃ।

দস্যুগণ গাড়ী লইয়া বিষ্ণুপুরে গেল। গাড়ী দেখিয়া রাজা মনে মনে স্থির করিলেন, গাড়ী পশ্চিম দেশের, নিশ্চয়ই ইহাতে বহুধনরত্ন আছে।

রাজা মহাহর্ষ-যুক্ত হইয়া সিন্ধুক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন—রাশি রাশি গ্রন্থ। গ্রন্থ দৃষ্টিমাত্রই রাজার হৃদয়ে কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল।—

"সম্পুটের মধ্যে দেখি গ্রন্থ রত্নগণ।
রাজা মহাখেদে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
'হায় হায় কি হইল দুর্দ্দৈব আমার।
কোন মহাশয়ে দুঃখ দিলুঁ মুঞি ছার॥
যদি মোর ভাগ্যে হয় তাঁর দরশন।
তবে গ্রন্থ রত্ন দিয়া লইমু শরণ॥" নঃ বিঃ॥

অনন্তর তিনি দস্যুগণের হাতে ধরিয়া কাতর ভাবে বলিলেন—"সত্য বল্, তোরা কাহাকেও প্রাণে বধ করিস্ নাই তো?" দস্যুগণ রাজার

এরূপ ভাবান্তর দেখিয়া বিস্মিত ভাবে কহিল—"হুজুর! তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলে আমরা গোপনে লইয়া আসিয়াছি।" রাজা আশ্বস্ত হইলেন।

এ দিকে শ্রীনিবাসাদি সকলে অতিকষ্টে ভয়ে ভয়ে সে রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত হইল; দেখিলেন গাড়ী নাই? দস্যুগণ গাড়ী দুইখানি পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলেন। মর্ম্মদাহী দুঃখে ও শোকে তাঁহাদের হৃদয় ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হায়! আশালতা ফলবতী হইতে না হইতেই বুঝি অঙ্কুরেই শুকাইল। তাঁহাদের করুণ-বিলাপে দিগন্ত বিষাদ-পাথারে ডুবিয়া গেল। অহো! সে রোদনধ্বনি শ্রবণ করিলে বুঝি পাষাণও বিগলিত হয়! দেশবাসী যাহাকেই সে কথা জিজ্ঞাসা করেন, রাজার ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করে না। অনেক অনুসন্ধানের পর হতাশ হইয়া ব্রজবাসী গাড়োয়ান ও রক্ষীগণকে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। আচার্য্য প্রভু নিকটবর্ত্তী লোকালয় হইতে কাগজ, কলম সংগ্রহ করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ লিখিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নামে একপত্র তাঁহাদের হস্তে পাঠাইলেন। অনন্তর আচার্য্যপ্রভু, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ তিনজনে বসিয়া সাশ্রুনয়নে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উন্মত্তের ন্যায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া গ্রামে গ্রামে গ্রন্থের বহু অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু গ্রন্থের কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না। তখন সকলে ভাবিতে লাগিলেন—"হায়! এত সাধ, এত চেষ্টা সকলই ব্যর্থ হইল? প্রভুর দেশে আসিয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিলাম না! নিশ্চয়ই প্রভুর চরণে আমাদের কোন অপরাধ হইয়াছে। অতএব এ জীবন ধারণে আর প্রয়োজন কি?"

"নরোত্তম কহে—আমি প্রাণ তেয়াগিব।
শ্যামানন্দ কহে—এই অনলে পশিব॥
শ্রীনিবাস আচার্য্যের মনে হৈল যাহা।
কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব তাহা॥" ভঃ রঃ॥

এই সময়ে একদিন শ্রীনিবাস আকাশ-বাণীতে শুনিলেন—কে যেন অলক্ষ্যে তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন—"শ্রীনিবাস! চিন্তা নাই। তুমি শীঘ্রই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইবে।"

আচার্য্যপ্রভু এ সংবাদ নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে জানাইলেন। প্রেমানন্দে তাঁহাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিল। বুঝিলেন—ইহা প্রভুরই লীলা! অবশ্য এই গ্রন্থ চুরি ব্যাপারে তাঁহার কোন গূঢ় প্রয়োজন আছে—বোধহয়, এই উপলক্ষে এই দেশবাসীকে ভক্তির অমিয়-প্রবাহে নিমগ্ন করিবেন, অপার করুণাধারা বর্ষণ করিয়া আপামর সকল জীবেরই উদ্ধার সাধন করিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গ্রন্থোদ্ধার।

যথা সময়ে শ্রীবৃন্দাবনে গ্রন্থ চুরির সংবাদ পঁহুছিল। শ্রীজীব পত্র পাঠ করিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইলেন। তাঁহার দু'নয়ন দিয়া দরদর ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি শ্রীলোকনাথগোস্বামী ও শ্রীভট্ট গোস্বামীর নিকট যাইয়া শ্রীনিবাসের পত্র দেখাইলেন। তাঁহারাও শোকে, ক্ষোভে অতিমাত্র মর্ম্মাহত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন

করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এ দুঃসংবাদ সমগ্র বৃন্দাবন মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীমদ্দাস গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই শোচনীয় কাহিনী শুনিবামাত্র একবারে বিবশ হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী এ নিদারুণ শোকাবেগ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অনুতাপ করিতে করিতে "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সেবকগণ ধরাধরি করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তীরে উত্তোলোন করিলেন। শ্রীদাস গোস্বামী তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন। তখন—

"নিজ নেত্র কৃষ্ণদাস রঘুনাথের মুখে।
চরণ ধরিল আনি আপনার বুকে॥
হে রাধা কুণ্ডতীর বাস দেহ স্থান।
রাধা প্রিয় রঘুনাথ হও কৃপাবান॥
যেই গণে স্থিতি তাহা করিতে ভাবন।
মুদিত নয়নে প্রাণ করিল নিস্ক্রায়ণ॥" প্রেঃ বিঃ।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী এইরূপে নিত্যধামে প্রস্থান করিলে শ্রীদাস গোস্বামী অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। *

এদিকে আচার্য্য প্রভু, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ গ্রামে গ্রামে গ্রন্থের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোথাও সন্ধান না পাইয়া একদিন আচার্য্য প্রভু নরোত্তমকে বলিলেন—

---

* কর্ণানন্দ গ্রন্থে বর্ণিত আছে—কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী গ্রন্থ চুরির সংবাদ শুনিয়া অন্তর্দ্ধান করেন নাই। গ্রন্থ প্রাপ্তির শুভ সংবাদ শুনিয়া আনন্দে অধীর

"খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
প্রভু লোকনাথ আজ্ঞা করহ পালন॥
শ্যামানন্দে পাঠাইবা সুসঙ্গতি মতে।
অম্বিকা হইয়া যাইবেন উৎকলেতে॥" ভঃ রঃ।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দ শ্রীনিবাসকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। শ্রীনিবাসকে একাকী রাখিয়া দেশে যাইতে তাঁহারা বড় কাতর হইলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন—"জীব-উদ্ধার ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ভার তোমাদের উপর, আর গ্রন্থ-প্রচারের ভার আমার উপর আছে। তোমরা তোমাদের কার্য্য কর, আমার কার্য্য আমি করি। গ্রন্থ কে লইয়াছে বা কোথায় আছে, তাহার সন্ধান জানিয়া পরে তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিব। সহজে না হয়, নিকটে বিষ্ণুপুর, রাজার সাহায্য লইয়াও গ্রন্থের অনুসন্ধান করিব, এবং যখন যাহা ঘটিবে পত্রদ্বারা তোমাদিগকে জানাইব।' অনন্তর—

"শ্যামানন্দ প্রতি কহে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
যাইবে উৎকল শীঘ্র খেতরা যাইয়া॥
বন বিষ্ণুপুরে আমি গ্রন্থ অন্বেষিব।
গ্রন্থ প্রাপ্তি সমাচার শীঘ্র পাঠাইব॥
এবে আর চিন্তা কিছু না করিও মনে।
এত কহি বিদায় করিলা দুইজনে॥ নঃ বিঃ।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, আচার্য্য প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা রোদন করিতে করিতে দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে যে দুঃখ উপস্থিত হইল তাহা প্রকৃতই বর্ণনাতীত।—

"প্রাতঃকালে দুইজনে হইলা বিদায়।
কে কহিবে যত দুঃখ উঠিল হিয়ায়॥
করে ধরি কহে শুন—ওহে নরোত্তম।
না পাইলে গ্রন্থ সব ছাড়িব জীবন॥
কান্দিয়া কান্দিয়া দোঁহে হইলা বিদায়।
ইহোঁ দেশ যান, তেহোঁ ভ্রমিয়া বেড়ায়॥ প্রেঃ বিঃ।

প্রেমভক্তির মণি-মালায় গৌড়বাসীকে বিভূষিত করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল গ্রন্থরত্ন প্রাণাধিক যত্ন করিয়া আনিতেছিলেন, হায়! তাহা কিনা অরণ্যমধ্যে দস্যুতে অপহরণ করিয়া লইল! ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? নরোত্তম শ্যামানন্দকে সঙ্গে লইয়া বিষণ্নমনে খেতরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ ও তাঁহার রাণী বহুদিন পরে প্রাণ-প্রতিম পুত্র নরোত্তমকে পাইয়া আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পাত্র, মিত্র, প্রজা সকলেই মহা আনন্দিত হইলেন। রাজ-ভবন আনন্দের উৎসব-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল।—

"শ্রীনরোত্তম দর্শনেতে সর্ব্বলোক।
মহা হর্ষ হৈলা পাসরিলা দুঃখশোক॥" ভঃ রঃ।

শ্যামানন্দ খেতরীতে নরোত্তমের সহিত দিবানিশি কৃষ্ণকথানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। শ্রীজীব আদেশ করেন, অতঃপর শ্যামানন্দের যাহা যাহা জানিবার আবশ্যক হইবে তাহা নরোত্তমের নিকট জানিয়া লইবেন। এজন্য, শ্যামানন্দ যে কয়দিন খেতরীতে রহিলেন প্রতিদিনই ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব লইয়া বিশেষ আলোচনা হইতে লাগিল। ভক্তের প্রাণারাধ্য কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে আত্মহারা হইয়া তাঁহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। তাঁহাদের

কাহিনীর মনোমদ সৌরভে খেতরী প্রমোদিত হইয়া উঠিল—সে স্নিগ্ধ সৌরভের ঘ্রাণে অনেক পাপী-পাষণ্ডীর প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া পুলকানন্দে নৃত্য করিল।

এ দিকে আচার্য্য প্রভু গ্রন্থের অন্বেষণ করিতে করিতে বন-বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলেন। পথে কৃষ্ণবল্লভ নামক এক ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। নগর হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে দেউটী গ্রামে কৃষ্ণ-বল্লভের নিবাস। তিনি সমাদর করিয়া শ্রীনিবাসকে তাঁহাদের বাটী লইয়া গেলেন। কৃষ্ণবল্লভ নিত্য রাজ সভায় গমন করেন। শ্রীনিবাস তাঁহার নিকট রাজা বীরহাম্বীরের সমস্ত পরিচয় পাইলেন; কিন্তু শুনিলেন রাজা দুরন্ত হইলেও পিতৃপুরুষগণের প্রথামত নিত্য পূজা অর্চ্চনা করেন এবং নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া আচার্য্যপ্রভুর হৃদয়ে একটু আশার সঞ্চার হইল। তিনি কৃষ্ণ বল্লভের সহিত একদিন রাজ সভায় গমন করিলেন। সে দিন কোন কথা হইল না। আবার পরদিন যথাসময়ে গমন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের, রাসলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে; কিন্তু পণ্ডিত যাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা বড়ই বিকৃত, শুনিয়া আচায্যপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিনীতভাবে পণ্ডিতের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করিলেন। পণ্ডিত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন রাজা, আচার্য্যপ্রভুর তেজোব্যঞ্জক আকার প্রকার ও অদ্ভুত প্রতিভা দর্শন করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হৃদয়ে আচার্য্য প্রভুকেই ব্যাখ্যা করিতে অনুমতি করিলেন। আচার্য্য প্রভু প্রেম-গদ্গদ্-কণ্ঠে এমন সুন্দর ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া রাজা ও সভাসদ্ সকলেই মহা চমৎকৃত হইলেন। সভাভঙ্গের পর রাজা শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্য বাসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আর সেই

তাঁহার স্থানে কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা লইলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহার নাম ব্যাসাচার্য্য রাখিলেন। তাহার কয়েকদিন পরে স্বয়ং রাজা বীরহাম্বীরও আচার্য্যপ্রভুর চরণে শরণ লইলেন। আচার্য্যপ্রভু রাজাকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার পারমার্থিক নাম "শ্রীহরিচরণ দাস" রাখিলেন। পরে অপহৃত সমুদয় শ্রীগ্রন্থ রাজভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত আছে দেখিয়া আচার্য্য প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

আচার্য্য প্রভু এই গ্রন্থ-প্রাপ্তি-সংবাদ ও রাজার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্ত-কাহিনী শ্রীবৃন্দাবনে গোস্বামী প্রভুগণকে জানাইবার জন্য পত্র লিখিলেন। কারণ, তাঁহারা গ্রন্থচুরির সংবাদে অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত আছেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে এ আনন্দ-সংবাদ অবশ্য জানান কর্ত্তব্য। এ দিকে রাজা বীরহাম্বীরও কহিলেন—

"শুন প্রভু এবে নিবেদিয়ে শ্রীচরণে।
গ্রন্থ চুরি হইল এ জানিল সর্ব্বজনে॥
গ্রন্থ প্রাপ্তি, মু' অধম দস্যুর দমন।
ঐছে পত্রী লিখিয়া পাঠান বৃন্দাবন॥
আর এই জানাইবা গোস্বামীগণেরে।
যেন মো পাপীরে সবে অনুগ্রহ করে॥
শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দ যথা।
ঐছে পত্রী পাঠাইতে আজ্ঞা হবে তথা॥" ভঃ রঃ।

আচার্য্য প্রভু রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া পূর্ব্বলিখিত পত্র প্রদান করিলেন। রাজা সেই অপহৃত গাড়ীতে নানাবিধ দ্রব্য বোঝাই দিয়া লোকদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পাঠ করিয়া শ্রীজীব আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাজা বীরহাম্বীরের দ্রব্য সমূহ বিভাগ করিয়া সকল দেবালয়ে পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে রাজার প্রেরিত দুইজন লোক আচার্য্য প্রভুর পত্র লইয়া খেতরীতে উপনীত হইল। ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ বিরলে কৃষ্ণ-কথালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন বনবিষ্ণুপুর হইতে আচার্য্য প্রভুর পত্র লইয়া লোক আসিয়াছে। নরোত্তম তখনই সে লোক দুটীকে নিকটে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। তাহারা আসিলে পত্র পাঠ করিয়া আনন্দে অধীর হইলেন! তখন—

"শুনি শ্যামানন্দ ভাসে আনন্দাশ্রু জলে।
দুই বাহু পসারিয়া দূতেরে করে কোলে॥" ভঃ রঃ।

* * * *

পত্রী পাঠ মাত্র শ্রীঠাকুর মহাশয়।
যে আনন্দ মগ্ন তাহা কহি, সাধ্য নয়॥
শ্যামানন্দ আনন্দ আবেশে কতক্ষণ।
উর্দ্ধবাহু করি কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন॥"

ঠাকুর মহাশয় রাজা শ্রীসন্তোষদত্তকে গ্রন্থপ্রাপ্তি সংবাদ ও রাজা বীরহাম্বীরের প্রতি আচার্য্য প্রভুর কৃপার কথা বিদিত করিলেন। রাজা সন্তোষ আনন্দিত হইয়া রাজদূতকে বিস্তর সম্মান করিলেন এবং দূতের মুখে বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইয়া মঙ্গল উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে বহু অর্থ দান করিলেন। অনন্তর ঠাকুর মহাশয়—

শ্রীশ্যামানন্দেরে বসাইয়া নিজ পাশে।
লিখিলেন পত্রী শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাসে॥
আপনার মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিলা॥
শ্যামানন্দ উৎকল যাবেন জানাইলা॥"

ঠাকুর মহাশয় রাজা বীরহাম্বীরকেও পৃথক্‌ভাবে একখানি পত্র লিখিলেন। যথাসময়ে দূত পত্র লইয়া বনবিষ্ণুপুরে চলিয়া গেল।

ইহার কয়েক দিবস পরেই ঠাকুর মহাশয় শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ অনুসারে শ্যামানন্দকে স্বদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। শ্যামানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের সুখ দুঃখের একমাত্র সঙ্গী। তিনি সেই শ্যামানন্দকে ছাড়িয়া কিরূপে স্থির থাকিবেন? এই চিন্তাতেই তিনি অস্থির হইলেন। কল্য প্রভাতে শ্যামানন্দ উৎকল যাত্রা করিবেন, ঠাকুর মহাশয় তাহার পূর্ব্বদিন হইতেই অশ্রুজলে সিক্ত হইতে লাগিলেন। একেই তো ঠাকুর মহাশয় স্বভাবতঃ স্নেহের মূর্ত্তি, তাহার উপর শ্যামানন্দের প্রতি তাঁহার যে অলৌকিক স্নেহ তাহা বর্ণনা করা যায় না। ঠাকুর মহাশয় একটু স্থির হইয়া শ্যামানন্দকে কহিলেন—"দেশে গিয়া তুমি আমাকে শীঘ্র এক পত্র পাঠাইবে। আমি নীলাচলে যাইয়া পুনরায় তোমার সহিত মিলিত হইব।"

শ্যামানন্দ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে মহা আনন্দিত হইলেন। শ্যামানন্দ কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সে রাত্রি যাপন করিলেন। প্রভাতে ঠাকুর মহাশয় অতি কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শ্যামানন্দকে বিদায় দিলেন—

"মুদ্রাদি সহিত এক লোক সঙ্গে দিলা।
গমন কালেতে মহা ব্যাকুল হইলা"॥
শ্যামানন্দ সিক্ত হৈলা নয়নের জলে।
নরোত্তমে প্রণময়ে পড়ি ভূমিতলে॥
তৈছে শ্রীঠাকুর নরোত্তম প্রণমিয়া।
নেত্র-জলে ভাসে শ্যামানন্দে আলিঙ্গিয়া॥ ভঃ রঃ।

* * * *

"বিদায়ের কালে যৈছে কথোপকথন।

রাজা সন্তোষ দত্ত শ্যামানন্দকে প্রণাম করিয়া বহু দৈন্য প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পদ্মানদীর তীর পর্য্যন্ত আগমন করিলেন। শ্যামানন্দ নৌকায় আরোহণ করিলে, রাজা সন্তোষ ও ঠাকুর মহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া রোদনে পাষাণ গলাইলেন। শ্যামানন্দও শোকাকুল হৃদয়ে এইরূপ ভাবে গমন করিতে লাগিলেন।—

"কত দূর যাই করে এক পরণাম।
আর কতদূর যাই, নিরখে বয়ান॥
পথে চলে যান মাথে দিয়া নিজ হাত।
সে কালে যে দুঃখ হৈল নিবেদিব কাথ॥" প্রেঃ বিঃ।

অনন্তর শ্যামানন্দ কাটোয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গবিগ্রহ দর্শন পূর্ব্বক শ্রীনবদ্বীপ হইয়া শান্তিপুরে গমন করিলেন। পরে তথা হইতে শ্রীপাট অম্বিকায় উপনীত হইলেন। দূর হইতে শ্রীগৌর-নিতাইয়ের শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রেমাবেশে তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। ঠাকুর হৃদয়-চৈতন্য শ্যামানন্দের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে অগ্রবর্ত্তী হইয়া আনিবার জন্য তখনই সেবকগণকে আদেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে শ্যামানন্দ আসিয়া ঠাকুরের চরণতলে পড়িয়া বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বাৎসল্য-রসে পরিপ্লুত, শ্যামানন্দকে ধরিয়া তুলিলেন এবং আলিঙ্গন করিতে চাহিলে শ্যামানন্দ দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

"তথাপি ঠাকুর আসিয়া সেইক্ষণে।
প্রেমাবেশে লৈল প্রভু মন্দির প্রাঙ্গণে॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্য চরণে সমর্পিলা।
প্রভু দেখি শ্যামানন্দ অধৈর্য্য হইলা॥" নঃ বিঃ

অনন্তর ঠাকুর শ্যামানন্দকে সঙ্গে লইয়া নিজ স্থানে আসিলেন।

আপনি প্রসাদ ভোজন করিয়া সেই নিজভুক্ত-শেষ শ্যামানন্দকে প্রদান করিলেন। শ্যামানন্দ তাহা পরমানন্দে ভোজন করিলেন। ভোজনাবসরে শ্রীগুরুর চরণান্তিকে বসিয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা কহিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া ঠাকুরের হৃদয় আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া গেল।

ঠাকুর, শ্যামানন্দকে একদিন কহিলেন—'বৎস! উৎকল যাইতে আর বিলম্ব করিওনা। তোমার দ্বারা বহুকার্য্য সিদ্ধ হইবে। যদিও তোমায় বিদায় দিতে প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে, তথাপি তোমার উৎকল গমন করা একান্ত প্রয়োজন।"

শ্যামানন্দ উৎকল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঠাকুর শ্রীগৌর-নিতাইয়ের স্থানে শ্যামানন্দের নিমিত্ত বহু কৃপা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর প্রসাদী-মালা আনিয়া শ্যামানন্দের গলায় পরাইয়া দিলেন। শ্যামানন্দকে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে রোদন করিতে দেখিয়া ঠাকুর ও তদীয় পরিকরগণ প্রবোধ বাক্যে কহিলেন—"চিন্তা কি? উৎকলে প্রভুর ভক্তি-রত্ন বিতরণ করিয়া সময় পাইলেই অম্বিকায় আসিবে। এখন যে কার্য্যের জন্য যাইতেছ, প্রভুর ইচ্ছায় তাহা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হউক।"

শ্যামানন্দ অশ্রুপূর্ণ লোচনে ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া উৎকল যাত্রা করিলেন। শ্রীনিতাই-গৌরের গুণগাথা গাহিতে গাহিতে যে পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই পথেই ভক্তি-ধর্ম্মের নূতন তরঙ্গ ছুটিল। স্বীয় হৃদয়-নিহিত ভক্তির প্রভাবে অন্যের প্রাণ মনকে মজাইতে শ্যামানন্দের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাই দেখিতে দেখিতে শত শত ব্যক্তি তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িল। তিনি প্রথমতঃ দণ্ডেশ্বর গ্রামে উপনীত হইলেন। এই দণ্ডেশ্বর গ্রামেই শ্রীকৃষ্ণ-মণ্ডলের পুর্ব্ববাস ছিল। শ্যামানন্দ তথা হইতে ধারেন্দায় বর্ত্তমান আলয়ে গমন করিলেন।

শ্যামানন্দের বৃদ্ধ পিতামাতা নিত্যধামে প্রস্থান করিয়াছেন। সংসারে তাঁহার কনিষ্ঠ-সহোদর বলরাম আছেন—আর আছেন শ্রীগৌরাঙ্গ-দাসী ঠাকুরাণী—শ্যামানন্দের পত্নী। শ্যামানন্দ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করেন, সেই সময়ে তিনি পিতামাতা ও আত্মীয়বন্ধুর একান্ত অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের আগমনে তাঁহারা আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন।

ঠাকুর মহাশয় ও আচার্য্য প্রভুর নামে পত্র লিখিয়া সেই পত্র সহ ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরিত লোককে বিদায় দিলেন। ঠাকুর মহাশয় সেই পত্র পাঠ করিয়া মহানন্দলাভ করিলেন এবং আচার্য্য প্রভুর নামে লেখা পত্র খানি শীঘ্রই লোক দ্বারা বনবিষ্ণুপুরে পাঠাইয়া দিলেন। আচার্য্য প্রভু নরোত্তম ও শ্যামানন্দের পত্র পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব স্নেহাবেশে অধৈর্য্য হইলেন।—

"জানি মহাশয়ের পত্রীতে সমাচার।
শ্রীশ্যামানন্দের পত্রী পড়ে বারবার॥
শ্রীশ্যামানন্দের কিছু অলৌকিক ক্রিয়া।
জানাইলা সবারে পরম হর্ষ হৈয়া॥
শ্রীবীর হাম্বীর রাজা মনের উল্লাসে।
মস্তকে ধরিল পত্রী লৈয়া প্রভুর পাশে॥
শ্রীশ্যামানন্দের গুণ চরিত্র শ্রবণে।
সে দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত ক্ষণে ক্ষণে॥ ভঃ রঃ।

এ দিকে শ্যামানন্দ শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনের সুধালহরী প্রবাহিত করিয়া বহুতর পশু-প্রকৃতি পাষণ্ডের উদ্ধার সাধন করিতে লাগিলেন। নানা প্রকারে প্রেম ভক্তির প্রচার দ্বারা জীবের হৃদয়ে এক অভিনব আনন্দের

অভিষিক্ত হইয়া অজ্ঞানের তামস-গহ্বর হইতে শনৈঃ শনৈঃ প্রেমময়ের প্রেমের রাজ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

——:*:—:*:——

রসিক মুরারি।

ধারেন্দায় কিছুদিন অবস্থানের পর শ্যামানন্দ প্রভু নৃসিংহপুরে গমন করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই নৃসিংহপুর, শ্যামানন্দের ভক্তি-প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তাঁহার ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র-স্থল হইল। মিষ্ট দ্রব্যের সন্ধান পাইলে যেমন শত শত পিপিলিকা আসিয়া তথায় মিলিত হয়, শ্যামানন্দের হৃদয়-ভাণ্ডারের অফুরন্ত প্রেমভক্তির পরিচয় পাইয়া নিত্য শত শত লোক আসিয়া তাঁহার পাদমূলে প্রণত হইতে লাগিল। ইহাই ভক্ত, ভক্তি ও ভক্তির আরাধ্য শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহিমা! শ্যামানন্দের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে বহুশত লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। শ্যামানন্দ দেব সেই শিষ্যগণের সহিত সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার করিতে লাগিলেন।—

“উৎকল মধ্যেতে শ্যামানন্দ বিলসয়।
শিষ্যগণ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন আস্বাদয়।
অতি মূঢ় পাষণ্ডীর করে পরিত্রাণ।
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি করে দান॥” ভঃ রঃ।

ইহার কিছুদিন পরে শ্যামানন্দ পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিলেন। এবার একাকী নহে। কয়েকজন অন্তরঙ্গ মর্ম্মী শিষ্য তাঁহার সঙ্গী হইলেন। বহুদিন পরে শ্রীজীব ও ব্রজবাসী ভক্তগণ শ্যামানন্দকে পাইয়া পরম সুখী হইলেন। একদা শ্যামানন্দ শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত কুঞ্জে বসিয়া ধ্যানানন্দে নিমগ্ন আছেন।—এমন সময়ে শ্রীশ্রীমদনগোপাল প্রত্যক্ষ ভাবে কহিলেন—"শুন শ্যামানন্দ! উৎকলে রসিকমুরারি নামে আমার এক প্রিয়তম ভক্ত আছে, তুমি শীঘ্র তথায় যাইয়া তাহাকে কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। সে তোমার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। তোমরা দুইজনে মিলিত হইয়া আমার প্রেমভক্তি প্রচার কর—উৎকলের সকল জীব উদ্ধার হইয়া যাউক।"

এই কথা শুনিয়া শ্যামানন্দ চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও কেহ নাই। তখন শ্যামানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতর হইয়া বহুক্ষণ রোদন করিলেন। পরে ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের আজ্ঞা স্মরণ হওয়ায় প্রাণে প্রাণে বিশেষ প্রীতি অনুভব করিলেন। প্রথমতঃ শ্রীগুরু আজ্ঞা, তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শ্রীমুখের আজ্ঞা! সুতরাং অবশ্যই শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু শ্রীব্রজধাম ত্যাগ করিয়া যাইতে শ্যামানন্দের প্রাণ-মন প্রতিক্ষণই ব্যাকুল হইতে লাগিল। শ্যামানন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন শ্যামানন্দের এই ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া শ্রীজীবকে স্বপ্নাবেশে কহিলেন—"শ্রীজীব! তুমি শ্যামানন্দকে উৎকলে যাইতে বল। তথায় আমার প্রিয়ভক্ত রসিকমুরারি শ্যামানন্দের জন্য মহা ব্যাকুল হইয়াছে। তুমি বলিলেই শ্যামানন্দ যাইবে।"

ধন্য ভগবানের ভক্তবাৎসল্য! ভক্ত শ্রীগুরুর চরণ-পদ্ম লাভের জন্য

সে প্রার্থনা পঁহুছিল। অমনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একবার শ্যামানন্দকে সাক্ষাৎ ভাবে আদেশ করিলেন, আবার শ্রীজীব গোস্বামীর দ্বারাও অনুরোধ করাইলেন।

শ্রীজীব শ্যামানন্দকে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা জানাইলেন। শ্যামানন্দ আনন্দের সহিত সে আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কহিলেন—

"নিশ্চয় যাইব আমি উৎকলভুবন।
দেখিব সে রসিক-মুরারি প্রিয়জন॥
হেনই কৃষ্ণের কৃপা আছয়ে যে জনে।
অবশ্য করিব দেখা সে পুরুষ সনে।" রঃ মঃ।

রসিক-মুরারি শিষ্টকরণ-বংশীয় রাজা শ্রীঅচ্যুতানন্দ দেবের পুত্র। রসিকের মাতার নাম শ্রীভবানী ঠাকুরাণী। রাজা অচ্যুত উড়িষ্যার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী রয়নী নগরের অধিপতি। রয়নী পুরাণ-প্রসিদ্ধ নগর। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে—

"মল্লভূমি মধ্যেতে রয়নী নামে গ্রাম।
গ্রামপাশে নদী সে সুবর্ণরেখা নাম॥
তথাই সুবর্ণরেখা উত্তর বাহিনী।
অখিল জীবের মহাকলুষ নাশিনী॥
রয়নী নিকটে বারায়তি নামে গ্রাম।
নিকটে ডোলঙ্গ নদী তীর রম্য স্থান॥
বারায়িতে রাম দশরথের নন্দন।
রামেশ্বর নামে শিব করিলা স্থাপন॥
রামচন্দ্র জানকী লক্ষ্মণ সহ সুখে।
কিছুদিন ছিলা বন ভ্রমণ কৌতুকে॥

অচ্যুত নামেতে সে দেশের অধিপতি।
প্রজা পালনেতে প্রীত অতিশুদ্ধ রীতি॥'

১৫১২ শকাব্দে কার্ত্তিক মাসের অষ্টাদশ দিবসে রবিবার শুক্লপ্রতিপদ্ তিথিতে অতিশুভলগ্নে রসিকানন্দের জন্ম হয়। রাজা অচ্যুত মহা-সমারোহে পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ যথাসময়ে সম্পন্ন করিলেন। পুরোহিত ও জ্যোতির্বিগণের নির্দেশক্রমে বালকের নাম প্রথমতঃ "রসিক" রাখা হইল। অনন্তর পণ্ডিতগণ রসিকের ভাগ্য গণনা করিয়া বলিলেন, এ বালকের ভক্ত-অংশে জন্ম। ইহাতে যে সকল উত্তম লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে এ বালক কালে এক মহাজন হইয়া প্রেম-ভক্তি বিতরণ দ্বারা উৎকলের আচণ্ডালকে উদ্ধার করিবে।"

এই কথা শুনিয়া রাজা অচ্যুত পরম হৃষ্টচিত্তে কহিলেন—"অতএব আপনারা এই আজ্ঞা করুন—কোষ্ঠীর প্রমাণে ইহার নাম রসিক থাকুক, কিন্তু সকলে, যেন বালককে "মুরারি দাস" বলিয়া ডাকে। এই হইতেই তাঁহার নামে "রসিক-মুরারি" হইল।

রসিকের বাল্য চেষ্টা অতীব অপূর্ব্ব। সাধারণ বালকের ভাব তাঁহাতে আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ-ভক্তের স্বভাব ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। নিরন্তর কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করেন, শ্রবণ করেন, তুলসী প্রদক্ষিণ করেন, প্রণাম করেন, কখনও বা বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া পরিশ্রুত-স্বরে হরিনাম গাহিতে গাহিতে নৃত্য করেন। যথা সময়ে রসিকের বিদ্যারম্ভ হইল। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি অল্পকালের মধ্যেই ষড়্ শাস্ত্রে প্রবীণ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ভক্ত-সুধী হরি দুবের স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। রসিক শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম চিন্তাতেই সর্ব্বদা বিভোর; সাংসারিক কোন ব্যাপারই তাঁহার আর ভাল লাগে না।

রাজা অচ্যুত, পুত্রের মতিগতি দেখিয়া বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত হিজলীর অধিপতি শ্রীবলভদ্র দেবের কন্যা শ্রীমতী ইচ্ছামতী দেবীর সহিত তাঁহার শুভ-পরিণয় মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। রসিকের রূপ-মাধুরী অনিন্দ্যসুন্দর; সাধারণতঃ মনুষ্যের তেমন অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্য দৃষ্ট হয় না। সে রূপ দেখিয়া সকলের চিত্তই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। আবার রসিক যেমন সুন্দর, ইচ্ছাদেবীও তেমনই পরমা সুন্দরী। সুতরাং অকলঙ্ক শারদ-সুধাংশুর পার্শ্বে কনকোজ্জ্বলা কৌমুদীর মিলনের ন্যায় এ মিলন, যেমন আনন্দময় তেমনই প্রীতিপ্রদ।

রসিক বিবাহ করিলেন, কিন্তু গৃহবাসী হইলেন না। তিনি কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হইয়া রাজা অচ্যুতের জমিদারীর মধ্যে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রয়নী হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী বর্ত্তমান সিংহভূম জেলার অন্তর্গত ঘাটশিলা নামক এক পবিত্র স্থান আছে। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ এই স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন। রসিক একদিন সেই স্থানে বসিয়া ধ্যান-স্তিমিত নয়নে কৃষ্ণ নাম জপ করিতে লাগিলেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ রসিকের ভক্তি-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন—

"আমার প্রেয়সী জন্ম শ্যামানন্দ রূপে।
প্রেমভক্তি দিয়া উদ্ধারিবে সর্ব্বজীবে॥
তারে সেবি পাইবেক আমার চরণ।
তোমা হৃদে আমি বিহরিব অনুক্ষণ॥ রঃ মঃ।

এই অমৃত-নিঃষ্যন্দিনী কথা রসিকের শ্রুতি-পথে যেমন প্রবেশ করিল অমনি তাঁহার দেহ-লতায় সাত্ত্বিক-ভাবকুসুম বিকসিত হইয়া উঠিল। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন—কোটীকন্দর্পনিন্দি-নবজলদ-শ্যাম এক পুরুষ

রত্ন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। রসিক দর্শনমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেবকগণের চেষ্টায় কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে তিনি গৃহে গমন করিলেন। কিন্তু---

"যেরূপ দেখিলা রসিক নয়ন গোচর।
অন্তরে জাগই সেইরূপ নিরন্তর॥
আজ্ঞা শুনি, উপদেশ-কর্ত্তা শ্যামানন্দ।
কবে সে দেখিব মুঞি সেই মুখচন্দ্র॥
কাহারে নাহিক কহেন মনের ভাবনা।
নিরবধি শ্যামানন্দ করে উপাসনা॥" রঃ মঃ।

রসিকের এইরূপ প্রাণের আবেগভরা আকর্ষণে এবং শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ক্রমে শ্যামানন্দ আর ব্রজে থাকিতে পারিলেন না। তিনি শ্রীজীব, হরিপ্রিয়া দাস প্রভৃতি ব্রজবাসী বৈষ্ণব-মহান্তগণের চরণে বিদায় লইয়া উৎকল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কিশোর, বালক, শ্যাম-দাস এবং ঠাকুর প্রসাদদাসও চলিলেন। ইহাঁরা শ্যামানন্দের সঙ্গে ব্রজে আসিয়াছিলেন। তিনি এই চারিজন শিষ্য সমভিব্যাহারে আগরা নগরে আসিয়া, সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিলেন। নগরের মধ্যে পাঁচজন অপরিচিত বৈষ্ণবকে নির্ভয়ে থাকিতে দেখিয়া, পাহারওয়ালা-গণ নগরের প্রধান শান্তিরক্ষককে সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তিনি আদেশ করিলেন—"তাহারা চোর কি সাধু, ঠিক নাই, আজ তাহাদিগকে কারা-গারে আবদ্ধ করিয়া রাখ, পরে কাল প্রাতে তাহার বিচার করা যাইবে।"

আদেশ মাত্র দূতগণ তখনই তাঁহাদিগকে ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিল। করুণাময় ভগবান্ ভক্তের দুঃখে অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন।

কক্ষে সেই শান্তিরক্ষক দিব্য পালঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন, দয়াল প্রভু তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সেই পালঙ্ক ধরিয়া সবলে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া, তাহার বক্ষের উপর বসিয়া নরসিংহ মূর্ত্তিতে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন—"আমার ভক্তগণ নগরের প্রান্তে বসিয়া আপনমনে হরিনাম জপ করিতেছিল, তুই অবিচারে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে রাখিলি, আজ তোকে সবংশে সংহার করিব।"

যাতনায় অস্থির হইয়া সে ব্যক্তি আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। পরিজনগণ ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, তাঁহার দেহ পালঙ্ক হইতে কক্ষতলে পড়িয়া লুটাইতেছে, ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে, স্বেদজলে সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইল। তখন তিনি দূতগণকে বলিলেন—"তোমরা যে পাঁচজন সাধুকে ধরিয়া রাখিয়াছ তাঁহারা সামান্য ব্যক্তি নহেন। তাঁহাদিগকে শীঘ্র আমার নিকট লইয়া আইস।"

আজ্ঞামাত্র দূতগণ কারাগার হইতে শ্যামানন্দকে ও তাঁহার চারিজন শিষ্যকে কোটালের নিকট লইয়া গেল। কোটাল সম্ভ্রমের সহিত শ্যামানন্দের চরণপ্রান্তে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমাভিক্ষা চাহিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দ পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন—"তুমি আজ হইতে আর বৈষ্ণবের প্রতি দ্বেষ করিও না, ভক্তির সহিত তাঁহাদের সেবা করিবে।

কোটাল শ্যামানন্দের বিশেষ অনুরক্ত হইল। এমন কি তাঁহার প্রীতি-ব্যবহারে বাধ্য হইয়া শ্যামানন্দ তথায় একমাস থাকিতে বাধ্য হইলেন। অনন্তর বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি তীর্থস্থান হইয়া অবশেষে রয়নীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, রসিক তখন ঘাটশিলায় আছেন, শ্যামানন্দ অবিলম্বে ঘাটশিলায়

গমন করিলেন। রসিক এই দিন নিশান্ত সময়ে স্বপ্নে শ্যামানন্দকে দর্শন করিয়াছিলেন। যথা—

"স্বপ্নে শ্যামানন্দদেবে দেখয়ে মুরারি।
পরম অদ্ভুত প্রতি অঙ্গের মাধুরী॥" রঃ মঃ।

শ্যামানন্দ রাজ-সভায় উপনীত হইলেন। দেখিলেন—দিব্য সভা! পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন, সপার্ষদ্ রাজা অচ্যুত ও রসিক অনন্যমনে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহারা অদূরে এক দিব্য-কান্তি সাধু পুরুষকে সেই দিকে আসিতে দেখিলেন।—

কিছু দূরে শ্যামানন্দ আনন্দে আইসে!
শ্রীকিশোর দাস আদি শিষ্য চারি পাশে॥
সূর্য্যসম তেজ শোভাময় কলেবর।
সহাস্য বদন পীন-বক্ষ মনোহর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ নাম লৈয়া।
প্রেমায় বিহ্বল চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥ ভঃ রঃ

এইরূপে শ্যামানন্দ যেমন সভামধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনিই—

"সগোষ্ঠী সহিত রাজা উঠিল ত্বরিত॥
দণ্ডবৎ করে ক্ষিতি পড়িয়া চরণে।
সবে দেখিলা যেন দ্বিতীয় নারায়ণে॥ রঃ মঃ।

রাজা পরম সমাদর করিয়া শ্যামানন্দকে বসাইলেন। রসিক সে রূপ-মাধুরী দেখিয়া প্রাণে প্রাণে বড় উল্লসিত হইলেন। শ্যামানন্দও রসিককে দেখিয়া চিনিলেন। পরস্পর পরিচয় নাই, সাক্ষাৎ নাই, অথচ উভয়েই দর্শন মাত্র কত জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন।

সভা ভঙ্গের পর রাজা অচ্যুত অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সকলেই স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। তখন শ্যামানন্দের সহিত রসিকের মিলন ও পরিচয় হইল। রসিক যে শ্যামানন্দের চিত্র সর্ব্বদা মানস-নেত্র সমক্ষে রাখিয়া প্রাণে প্রাণে পূজা করিতেছিলেন, আজ সেই আরাধ্য গুরুদেবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া বিরহ-বিভ্রান্ত রসিক আর স্থির থাকিতে পারেন কি? তিনি সেই দণ্ডে শ্যামানন্দের চরণপ্রান্তে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দ রসিককে স্নেহালিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিলেন। সে সময়ে উভয়ের মধ্যে যে অপূর্ব্ব ভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইল, তাহা নিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত হয়না,—সে ভাব-মাধুর্য্য ভাষায় পরিস্ফুট করাও যায় না। তখন শ্যামানন্দ বলিলেন—"দেখ রসিক! তুমি কৃষ্ণের পরিষদ্ ভক্ত; কৃষ্ণের আজ্ঞায় আমি ব্রজধাম হইতে তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

রসিক ব্রীড়াবনত বদনে করযোড় করিয়া বলিলেন 'প্রভো! আমি জন্মে জন্মে আপনার দাস, দাসকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্তই দর্শন দান করিলেন।"

কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বল রসিকানন্দের সম্মিলনে শ্যামানন্দ অপার আনন্দ লাভ করিলেন। পূর্ব্বে বাল্যকালে "দয়ালদাসী" নাম্নী এক পরমা বৈষ্ণবী রসিকের কর্ণে শ্রীহরিনাম-মন্ত্র দান করিয়াছিলেন, পরে শ্যামানন্দ তাঁহাকে যথারীতি শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া প্রেমভক্তির নিগূঢ় সাধন প্রণালী সকল শিক্ষা দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বৈরাগ্যের প্রবল-প্রভঞ্জনে তাঁহার বিষয়-বাসনা সুদূরে উড়িয়া গেল। ভক্তির মন্দাকিনী ধারায় হৃদয় যেমন পরিপ্লুত হইল, অমনই ব্রজরসের অমৃত-উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিল। কিছুদিন পরে রসিকের পত্নী শ্রীমতী ইচ্ছাদেবীও শ্যামানন্দের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। শ্যামানন্দ তাঁহার সিদ্ধ নাম "শ্যামদাসী" রাখিলেন।

একদিন শ্যামানন্দ রসিকের গৃহে উপবেশন করিয়া আছেন। এমন সময়ে রসিকের বালিকা কন্যা দেবকী তথায় আসিলেন। শ্যামানন্দ তাঁহাকে স্নেহভরে কোলে লইয়া তাঁহার কর্ণে "হরেকৃষ্ণ" ষোল নাম শুনাইলেন। দেবকী শ্রীনাম শ্রবণমাত্র প্রেমাবিষ্টা হইয়া "হা গৌরাঙ্গ" হা গোবিন্দ" বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। নয়ন-কুবলয়দু'টী যেন অশ্রুজলে সাঁতার দিতে লাগিল। অবশেষে শ্যামানন্দের আদেশে দেবকীর বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল। এইরূপে শ্যামানন্দ রয়নীনগরের অনেককেই কৃষ্ণপ্রেমে, শ্রীগৌরাঙ্গের নামে কাঁদাইয়া নাচাইয়া মজাইলেন। দেখিতে দেখিতে শত শত ব্যক্তি শ্যামানন্দের শিষ্য হইলেন। তাঁহাদের কণ্ঠোত্থিত সঙ্কীর্ত্তনের মঙ্গল-মধুর ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্রই ভক্ত ও ভগবানের জয় ঘোষিত হইতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নরোত্তম মিলন।

কৃষ্ণ-প্রেম-বিভ্রান্ত ঠাকুর নরোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থান সকল দর্শন করিবার অভিলাষে বহির্গত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ জগতের প্রেমধর্ম্ম-শিক্ষা-দীক্ষার শ্রীপাট স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ দর্শন করিয়া পরে শান্তিপুর ও খড়দহে গমন করিলেন। ভক্তগণ সঙ্গে পরমানন্দে তত্তৎস্থলে কিছুদিন অবস্থান করিয়া, অবশেষে তিনি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। ঠাকুর মহাশয়ের আগমনে শ্রীনীলাচলবাসী গৌর

ভক্তগণের প্রাণে এক নূতন ভাবের তরঙ্গ বহিল। শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ-বহ্নিতে তাঁহাদের হৃদয় পরতে পরতে পুড়িতেছিল, নরোত্তমের দর্শনে প্রতপ্ত মর্ম্মোচ্ছ্বাসের সহিত সে বিরহবহ্নি যেন দ্বিগুণতর জ্বলিয়া উঠিল। ঠাকুর মহাশয় প্রভুর এক একটী লীলাস্থান দর্শন করেন, আর অমনিই পূর্ব্ব স্মৃতির মুর্ম্মুরদাহে হৃদয় অধীর হইয়া উঠে। নয়নজলে বক্ষ পরিসিক্ত হইয়া যায়। এইরূপে কিছুকাল শ্রীপুরুষোত্তমধামে অবস্থানের পর তিনি ভক্তগণের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বিদায়ের কালে তাঁহারা ঠাকুর মহাশয়ের হাতে ধরিয়া বলিলেন—

"পূরিল মনের সাধ দেখিনু তোমারে।
শ্রীনিবাসে পুনঃ না দেখিব নেত্র দ্বারে॥
শুনিলাম দুঃখী কৃষ্ণদাস যোগ্য অতি।
শ্যামানন্দ নাম তাঁর হইল সম্প্রতি॥
তাঁহারে দেখিতে মনে বড় সাধ ছিল।
এত কহি সবে নেত্র জলে সিক্ত হৈল॥ ন কিঃ।

ঠাকুর মহাশয় অশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। পরে তথা হইতে প্রিয়-সুহৃদ্ শ্যামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে নৃসিংহপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। নীলাচল হইতে নরোত্তম ঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া শ্যামানন্দ আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তিনি তখনই নিজগণ সঙ্গে অগ্রবর্ত্তী হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিলেন। উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া একবারেই অধৈর্য্য।—

"দোঁহে দোঁহে দেখি অতি অধৈর্য্য হইয়া।
ভাসে নেত্র জলে দুঁহু দোঁহে প্রণমিয়া॥

নরোত্তম শ্যামানন্দে ধরিলেন কোলে।
ছাড়িতে নারয়ে হিয়া আনন্দ উথলে॥
দেখিয়া সকল লোক অদ্ভুত মিলন।
নিবারিতে নারে নেত্রে ধারা অনুক্ষণ॥ নঃ বিঃ।

নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সেই অপূর্ব্ব মিলন, পবিত্র সাগর-সঙ্গম অপেক্ষাও বুঝি অধিক পুণ্যতীর্থ! তাই, সে মিলন দর্শন করিবার নিমিত্ত শত শত লোক ছুটিয়া চলিল। যে দেখিল তাহারই প্রাণ-মন যেন ভক্তিরসে গলিয়া গেল, তাহারই নয়নে অশ্রুর সুধাবিন্দু ঝরিল!

শ্যামানন্দ ঠাকুর নরোত্তমকে নিজালয়ে লইয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহুতর লোক আসিতে লাগিল। শ্যামানন্দ সেই লোক সংঘট্টের ভয়ে নির্জ্জন স্থানে তাঁহার বাসা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তথাপি নিত্য বহুলোক তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইতে লাগিল। ঠাকুর মহাশয় যে কয়দিন নৃসিংহপুরে রহিলেন, প্রতিদিনই মহোৎসব হইল। শ্যামানন্দের যত্নে ও আদর-আপ্যায়নে ঠাকুর মহাশয় আনন্দরসে গলিয়া গেলেন বিশেষতঃ শ্যামানন্দের কৃপায় দেশবাসী ধন্য হইয়াছে, দেখিয়া তিনি অধিক আনন্দিত হইলেন। এক দিন তিনি শ্যামানন্দকে নিকটে বসাইয়া কহিলেন—"দেখ, শ্রীনীলাচলে যে সকল প্রভুর পরিকর আছেন, তাঁহারা প্রভুর বিচ্ছেদে মৃতপ্রায়—যেন প্রভুর ইচ্ছা মতেই দেহে জীবন আছে মাত্র। তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।—

"তোমারে দেখিতে সাধ করেন সকলে।
বিলম্ব না কর শীঘ্র যাহ নীলাচলে॥
তথা তা' সবার করি চরণ দর্শন।

কিছু দিন পরে পত্রী দিব পাঠাইয়া।
যাইব খেতরী গ্রামে নিজগণ লৈয়া॥ নঃ বিঃ।

শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে ঠাকুর মহাশয় কিছু দিন তথায় অবস্থান করিয়া বিদায় হইলেন। বিদায়ের কালে উভয়েই মহাব্যাকুল হইলেন। রসিকানন্দ এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, ঠাকুর মহাশয় নিবিড় স্নেহালিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে খেতরী যাইবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। এইরূপে তিনি সকলের সহিত যথা যোগ্য বিদায় সম্ভাষণ করিয়া খেতরীতে চলিয়া গেলেন।

শ্যামানন্দও শ্রীনীলাচল-চন্দ্রমা দর্শনের অভিলাষী হইলেন। রসিক, সঙ্গে যাইতে চাহিলে বলিলেন—"বৎস! আমি নীলাচল হইয়া ব্রজধাম যাইব। এখন আমার সঙ্গে তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। পরে শ্রীবৃন্দাবনে তুমি আমার সহিত মিলিত হইও।"

এই বলিয়া শ্যামানন্দ শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীনীলাচল যাত্রা করিলেন। রসিকানন্দ তাঁহার সহিত চাকলিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত যাইলেন। চাকলিয়ায় দামোদর নামে এক মহাপণ্ডিত অদ্বৈতবাদী যোগী আছেন। তিনি রসিকের বাল্য-বন্ধু। উভয়ে একত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়া ছিলেন। রসিক শ্যামানন্দকে লইয়া তাঁহার ভবনে উপনীত হইলেন। পরস্পর পরিচয়ের পর শ্যামানন্দের সহিত দামোদরের বিচার আরম্ভ হইল। এক দিন নহে, ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া সে শাস্ত্র যুদ্ধ চলিল।—

"বৈদান্তিক যোগীবর নানা শাস্ত্র জানে।
শ্যামানন্দ সঙ্গে বিচার হৈল বহু দিনে॥
যোগীর অদ্বৈতবাদ বিচারে খণ্ডিল।
গোস্বামীর মত দ্বারা দ্বৈত সংস্থাপিল॥

বিচারেতে যোগীবর হৈলা পরাজয়।
মনে মনে শ্যামানন্দে বহু প্রশংসয়॥ প্রেঃ বিঃ।

রসিকানন্দ শ্যামানন্দের স্থানে কৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা লইবার জন্য দামোদরকে কহিলেন এবং জানাইলেন—তিনিও সগোষ্ঠী এই প্রভুর চরণে মস্তক বিকাইয়াছেন।

দামোদর বিচারে পরাস্ত হইলেও শ্যামানন্দের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। কিন্তু শ্যামানন্দের অগাধ পাণ্ডিত্য, শান্ত-মধুর প্রকৃতি ও অপূর্ব্ব তেজোব্যঞ্জক কান্তি দর্শন করিয়া তাঁহার শুষ্ক হৃদয়েও এক অভিনব ভাবের উদয় হইল। তিনি গর্ব্বপূরিত বাক্যে রসিককে বলিলেন—"যদি ইঁহাতে কোন অলৌকিক প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহা হইলে অবশ্যই শরণ লইব।"

চাকলিয়া গ্রামের প্রান্তভাগে থর্ব্বা নদী নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আছে। সেই তটিনীর তীরবর্ত্তী এক বিজন অরণ্য মধ্যে দামোদর প্রতিদিন যোগাভ্যাস করিতে যান। দামোদর আজও তথায় গমন করিলেন। দেখিলেন, অরণ্যের সেই নিত্য পরিচিত শ্যাম-শোভা যেন আজ কি এক অপ্রাকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। ক্ষীণ-কলেবরা থর্ব্বা তরল-তরঙ্গ-ভঙ্গে যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। ফুল্ল-কুসুম-কলাপের হাস্য-মাধুরী, বিহঙ্গের স্বর-লহরী, চটুল ভৃঙ্গকুলের গুঞ্জন-চাতুরী যেন শ্রীবৃন্দাবনের মোহন মাধুর্য্য বিকাশ করিতেছে। দামোদর যোগাসনে বসিয়া ধ্যানস্তিমিত নয়নে দেখিলেন—"রত্নময় দিব্য শ্রীমন্দির আর সেই শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে মণিময় সিংহাসনে—

"নবীন কিশোর মূর্ত্তি শ্যামল সুন্দর।
ত্রিভঙ্গ ললিত বংশী শিখি-পুচ্ছধর॥

পীতবাস পরিধান মনোহর বেশে।
শ্যামানন্দে দেখিলেন তাঁর বামপাশে॥" রঃ মঃ।

দামোদর অতৃপ্ত-নয়নে সেই মনভুলান, প্রাণ-মাতান অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সাত্ত্বিক বিকারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অবিরল অশ্রু-ধারায় নয়নের দৃষ্টি-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন—সেই ভক্তের বাঞ্ছনীয় ভুবন-মনোহর দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়াছে। সেদিন দামোদরের আর যোগাভ্যাস হইল না। তিনি কি-জানি-কি এক নূতন জীবন লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দূর হইতে শ্যামানন্দকে দর্শন করিয়াই ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্যামানন্দ ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বলিলেন—

"যেরূপ দেখিলে তুমি আপন নয়নে।
সব ছাড়ি সেইরূপ করহ ধেয়ানে॥" রঃ মঃ।

দামোদর শুষ্ক যোগ-মার্গ পরিত্যাগ করিয়া আনন্দময় ভক্তি-পথের পথিক হইলেন; কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে সদ্গোপ শ্যামানন্দের স্থানে মন্ত্র লইবেন, এই চিন্তা ও অভিমানের ঘন-ঘটা তখনও তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিল।

একদিন শ্যামানন্দ নিভৃতে বসিয়া শ্রীহরিনাম জপ করিতেছেন। এমন সময় দামোদর তথায় আসিয়া দেখিলেন, শ্যামানন্দের অঙ্গ হইতে যেন শত-ভাস্কর-প্রভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে এবং বক্ষের উপর শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় যজ্ঞোপবীত ঝলমল করিতেছে।—

"শ্যামানন্দের রূপ দেখে পরম উজ্জ্বল।

হেনকালে রসিকাদি আইলা ভক্তসব।
দণ্ডবৎ প্রণাম করি, কৈলা বহু স্তব॥
শ্যামানন্দ যজ্ঞোপবীত করিলা গোপন।
তেজ ঢাকি আরম্ভিলা নাম সঙ্কীর্ত্তন॥ প্রেঃ বিঃ।

দামোদরের অভিমান চূর্ণ হইল। দামোদর শ্যামানন্দের চরণ যুগল মস্তকে ধারণ করিয়া বহু রোদন করিলেন। তাঁহার দৈন্য-কাতরতা দেখিয়া শ্যামানন্দ তাঁহাকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন।

বাহিরে কেবল যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। হৃদয়ে ব্রহ্মণ্য-শক্তির বিকাশ থাকা চাই। নতুবা যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব আদৌ অবগত নহেন, কেবল ব্রহ্ম-সূত্র ধারণেই গর্ব্বিত, তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের অভিমান বৃথা। ব্রহ্মোপনিষদে বর্ণিত আছে—

সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরং পদং।
তৎ সূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রঃ বেদপারগঃ॥

অর্থাৎ পরমপদ ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মসূত্র। যিনি এই সূত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবগত, তিনিই বিপ্র, তিনিই বেদজ্ঞ।

বহিঃ সূত্রং-ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ স চেতনঃ॥

অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি উত্তম যোগমার্গকে আশ্রয় করিয়া বাহ্য সূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যিনি ব্রহ্মভাবময় সূত্র ধারণ করেন, তিনিই জ্ঞানী।

আবার যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি ভুবন-পূজ্য—তিনি ব্রাহ্মণেরও বরণীয়। আর যিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও ভগবদ্ভক্তি-বিহীন তিনি চণ্ডালেরও অধম। অতএব ব্রাহ্মণ হউন, ন্যাসী হউন, শূদ্র হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা,

হইলেও গঙ্গার যেমন পবিত্রতা বিনষ্ট হয় না; পরন্তু সেই জলধারা-সমূহ গঙ্গোদকের পবিত্র-স্বরূপতা লাভ করে। সেইরূপ পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের অমল প্রবাহে যিনি আপনার প্রাণ-মন একান্ত ভাবে ডুবাইয়া ফেলিয়াছেন—অন্তরে বাহিরে পূর্ণ বৈষ্ণব-লক্ষণে ভূষিত হইয়াছেন তিনি সকল বর্ণেরই গুরু-পদ-বাচ্য। তাদৃশ ভক্ত নীচবংশোদ্ভব হইলেও নির্ম্মল ঋষি। ইহাই ভক্তির বিশ্ববিজয়িনী শক্তির নিদর্শন—ইহাই ভক্তের জ্বলন্ত মহিমা। তাই, প্রেমবিলাসে বর্ণিত আছে—

"শ্যামানন্দ হয় মহাপুরুষ রতন।
সদ্গোপ আছিলা তেঁহো হইলা ব্রাহ্মণ॥
ভজনের এত গুণ জানে সর্ব্বজন॥"

এইরূপ অসামান্য ভক্তির মহিমায়—বৈষ্ণবতার পূর্ণ প্রভাবে শ্যামানন্দ-দেব এবং তদীয় অশেষ কৃপাভাজন রসিকানন্দ বহুশত ব্রাহ্মণের নিকট গুরুর পূজা লাভ করিয়াছিলেন—অনেক শ্রেষ্ঠবর্ণাভিমানী ব্যক্তি তাঁহাদের চরণোদক পান করিয়া জীবন-কৃতার্থ মানিয়াছিলেন। আজও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীপাটগোপীবল্লভপুরের গোস্বামী বংশে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

পিতা যেমন অনুরক্ত সকল সন্তানের প্রতিই সমান স্নেহবান্, শ্রীভগবান্‌ও সেইরূপ সকল ভক্তকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ বিচার, তোমার আমার নিকট মাত্র।—শ্রীভগবানের নিকট নাই। যে তাঁহার ভক্ত, সেই ব্রাহ্মণ। এইখানেই ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধ। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু; কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন, যিনি ভক্ত, তিনিই গুরু। বৈষ্ণবধর্ম্মে জাতি বুদ্ধি বা জাত্যভিমান নাই। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের অধিকার নাই; কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম এরূপ অনুদার নহে, জগতের

সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকই বৈষ্ণব ধর্ম্মে অধিকারী। আবার বৈষ্ণব হইলে, তিনি অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও বড়। ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বা ভক্তি ধর্ম্মের বিশেষত্ব—ইহাই বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য!

দামোদরের দুই পত্নী ও তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সকলেই শ্যামানন্দের নিকট দীক্ষামন্ত্র লইলেন। এই হইতেই রসিক ও দামোদর দুই প্রধান শিষ্য শ্যামানন্দের দুই বাহুস্বরূপ হইলেন। পূর্ব্বে নেত্রানন্দ, কিশোর ও হরিদাস শিষ্য হইয়াছিলেন। ইহাঁদের দ্বারাও ধর্ম্মপ্রচারের বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল।

এইরূপে শ্যামানন্দ তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া শ্রীনীলাচলে গমন করিলেন। তথায় শ্রীনীলাচল-নাথের শ্রীমুখ-শশীর সুধারাশি তৃষিত চকোরের নয়ন যুগলে পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। প্রাণের অদম্য পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতঃপর ভক্তগণসঙ্গে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ-লীলা কথা রঙ্গে কিছু-দিন বিশ্রাম করিয়া, শ্যামানন্দ শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করিতে গমন করি-লেন। প্রথমেই শ্রীজীব গোস্বামীর কুটীরে উপনীত হইলেন এবং ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীজীবকে প্রণাম করিলেন। তখন—

"স্নেহাবেশে গোস্বামী করিয়া আলিঙ্গন।
কহিলেন সুধাময় মধুর বচন॥
শ্যামানন্দে যৈছে স্নেহ কে কহিতে পারে।
ঐছে কৈল মন স্থির হয় যে প্রকারে॥" ভঃ রঃ॥

অনন্তর শ্যামানন্দ যখন শুনিলেন, শ্রীনিবাস আচার্য্যও শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। তিনি সেই দণ্ডেই আচার্য্য প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

"শ্যামানন্দ দেখিয়া আচার্য্য শ্রীনিবাসে।
ভূমে পড়ি প্রণমিল মনের উল্লাসে ॥
শ্রীনিবাস যথাযোগ্য আচরণ করি।
বসাইলা পাশে শ্যামানন্দে করে ধরি ॥
পরস্পর কহিয়া সকল সমাচার।
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ভঃ রঃ ॥

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে প্রকৃতিস্থ হইয়া বিদায় হইলেন। আচার্য্যপ্রভু শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট এবং শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট থাকেন। কিন্তু নিত্যই শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দে মিলন হয়। সে মিলনে প্রেমানন্দের অমৃত-উৎস স্বতঃই উৎসারিত হয়। এইরূপে শ্যামানন্দ কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া মথুরায় গমন করিলেন। ঠিক এই সময়েই রসিকানন্দ শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। তিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাশ্যামের প্রত্যেক লীলাস্থানই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে তথা হইতে মথুরায় শ্যামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। শ্যামানন্দ রসিককে পাইয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। কহিলেন—"রসিক! শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হইল তো, এখন উৎকলে গমন কর। তোমার জন্য উৎকলবাসী ভক্তগণ মহাব্যাকুল হইয়াছেন।"

রসিক শ্রীবৃন্দাবনে আরও কিছুদিন থাকিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। শ্যামানন্দ স্নেহ-মধুর বাক্যে কহিলেন—"বৎস! তুমি না থাকিলে তোমার পরিজন মহাদুঃখ পাইবে এবং সকলেই আমার দোষ দিবে। অতএব তুমি শীঘ্র বাড়ী চলিয়া যাও। বিশেষতঃ উৎকলের ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে তোমার প্রতি ও আমার প্রতি প্রভুর আদেশ আছে। সে দিন শ্রীগোবর্দ্ধনে ব্রজবাসীর রূপ ধারণ করিয়া

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তোমাকে এই আদেশই তো করিয়াছেন; তুমি কিরূপে সে আদেশ লঙ্ঘন করিবে।”

রসিক চমৎকৃত হইলেন। এ নিগূঢ় রহস্য শ্যামানন্দ দেব কিরূপে জানিতে পারিলেন? রসিক স্বীয় গুরুদেবের এই অসামান্য মহিমা অবগত হইয়া প্রেমাবেশে পুলকিত হইলেন। তিনি শ্যামানন্দের চরণে বিদায় লইয়া উৎকল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্যামানন্দ তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনিও শীঘ্র উৎকলে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।

শ্যামানন্দ মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজও শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়াছেন। শ্যামানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গৌড়ের সমাচার অবগত হইলেন। গৌড়দেশ আবার অজ্ঞানতার নিবিড় তিমিরে আবৃত হইয়া উঠিয়াছে, পিশাচের লীলাভূমি হইয়াছে। প্রেমভক্তির প্রবল জোয়ারে ভাটা পড়িয়াছে। ভক্তগণ হৃদয়-বিদারী করুণশব্দে বিলাপ করিতেছেন। পাষণ্ডগণ উপহাসের অট্টহাস্য করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর কুঞ্জে মহোৎসব হইয়া গেল। তাহার পর দিনেই শ্রীনিবাস গৌড় যাত্রা করিলেন। শ্রীজীব শ্যামানন্দকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন এবং “শ্রীগোপাল চম্পূ” প্রভৃতি যে যে গ্রন্থ পূর্ব্বে সংশোধন করিয়াছিলেন তাহাও লোক দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। তখন—

“শ্রীনিবাস সবার চরণে প্রণমিয়া।
চলে গোবিন্দের মুখচন্দ্র নিরখিয়া॥
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ ব্যাকুল অন্তরে।
পুনঃপুনঃ প্রণময় গোস্বামী সবারে ॥

শ্রীজীব ব্যাকুল হ'য়ে চলে কতদূর।
পুনঃপুনঃ নিষেধয়ে আচার্য্য ঠাকুর ॥' ভঃ রঃ।

এইরূপে আচার্য্যপ্রভু, শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন হইতে বিদায় হইয়া বনবিষ্ণুপুরে উপনীত হইলেন। রাজা বীরহাম্বীর তাঁহাদের আগমন সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে বাটীতে লইয়া আসিলেন। আচার্য্য প্রভু, শ্যামনন্দ ও রামচন্দ্রের সহিত রাজার পরিচয় করিয়া দিলেন। তখন—

'রাজা বীরহাম্বীর পড়িল ভূমিতলে।
দুই পদে প্রণমি ভাসয়ে নেত্রজলে ॥
উল্লাসে কহয়ে রাজা কি ভাগ্য আমার।
প্রভুর কৃপায় পাইনু চরণ দোঁহার ॥" ভঃ রঃ ॥

শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র রাজাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। রাজা বহুদিন হইতে শ্যামানন্দের দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন—অদ্য তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া তাঁহার পিপাসিত-প্রাণ শীতল হইল।—কিন্তু আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। দশদিন পরে শ্যামানন্দ উৎকল গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া প্রথমতঃ মহা অধৈর্য্য হইলেন। পরে ভাবিলেন—মহান্তের ভাব ও চেষ্টা বুঝিবার শক্তি কাহার আছে? সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া জীবের উদ্ধার সাধন করাই তাঁহাদের কার্য্য। অতএব তিনি একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন কেন? এবং অধম আমি, তাঁহার কার্য্যে বাধা দিয়া অপরাধী হই কেন?"—অবশেষে শ্যামানন্দের জন্য উপহারযোগ্য বহু দ্রব্য আনিলেন। আচার্য্য প্রভু তদ্দর্শনে মনে মনে মহাসুখী হইলেন। ভারবাহকগণ সেই সকল দ্রব্য লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইল। শ্যামানন্দ, আচার্য্যপ্রভুর চরণে প্রণাম

"আচার্য্য ঠাকুর ধৈর্য্য ধরিতে না পারি।
শ্যামানন্দে কহে কত আলিঙ্গন করি॥
শ্যামানন্দ সিক্ত আচার্য্যের নেত্র জলে।
আচার্য্যেরে প্রণময়ে পড়ি ভূমিতলে॥" ভঃ রঃ।

আচার্য্য প্রভু শ্যামানন্দের হস্ত ধারণ করিয়া স্নেহাবেশে সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিলেন। শ্যামানন্দ, রাজা বীরহাম্বীর ও রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলের স্থানে বিদায় লইয়া ব্যাকুলভাবে উৎকল পথে অগ্রসর হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বহু লোকজন সমভিব্যাহারে নৃসিংহপুরে উপনীত হইলেন। শ্যামানন্দের আগমন সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। রসিকানন্দ দামোদর প্রভৃতি সকলেই তাঁহার দর্শন করিতে আসিলেন। চারিদিকেই আনন্দের কোলাহল উঠিল। চন্দ্রোদয়ে সাগর-বক্ষ যেমন উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে, শ্যামানন্দের আগমনে সেইরূপ সমগ্র উৎকল দেশের মধ্যে আবার ভক্তিধর্ম্মের নূতন জোয়ার খেলিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

খেতরীর মহোৎসব।

শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকারের বাটীতে যেরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীবিগ্রহ আছেন, নরোত্তম ঠাকুরও সেইরূপ শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবল্লবীকান্ত বিগ্রহ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ আনন্দের সহিত তাহাতে সম্মতি দান করিলেন। দেশবাসী সকলেই সে শুভকার্য্যে

যোগ দিল,—মহোৎসবের বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি শুভ ফাল্গুনী পুর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপনের দিন স্থির হইল। ঠাকুর মহাশয় বুধরী গ্রামে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের বাড়ীতে আচার্য্যপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহোৎসবের সকল বন্দোবস্ত করিলেন। এই বিরাট মহোৎসবে গৌড়বাসী সমস্ত বৈষ্ণবগণকে আমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত বহুতর পত্র লেখা হইল। রাঢ়ে, বঙ্গে, বারেন্দ্রে, উৎকলে যেখানে যেখানে শ্রীমহাপ্রভুর ভক্তগণ আছেন, সর্ব্বত্রই লোক দ্বারা পত্র বিলি আরম্ভ হইল।

যথাসময়ে আমন্ত্রিত বৈষ্ণব-মহান্তগণ খেতরীতে আগমন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য প্রভু, পূর্ব্ব হইতে খেতরীতে যাইয়া মহোৎসবের সমস্ত কর্ত্তৃত্বভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন মহান্তগণ আসিতেছেন অমনই অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য যথোপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইতেছে। ফলতঃ আচার্য্য প্রভুর সুবন্দোবস্তে কাহারও কোন অসুবিধা বা অভাব নাই।

শ্যামানন্দের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া শ্রীনিবাস ও ঠাকুর মহাশয় মহা চিন্তিত হইলেন। এমন সময় লোক আসিয়া সংবাদ দিল, বহু শিষ্য প্রশিষ্য সঙ্গে লইয়া শ্যামানন্দ দেব আগমন করিয়াছেন। এই শুনিয়াই তাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন। নিজগণ সহ ঠাকুর মহাশয় অগ্রবর্ত্তী হইয়া শ্যামানন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া প্রথমেই আচার্য্য প্রভুর বাসায় আনিলেন।—

"শ্যামানন্দ আচার্য্যেরে করিয়া দর্শন।

আচার্য্য ঠাকুর স্নেহে নারে স্থির হৈতে।
ধরি কৈলা কোলে শ্যামানন্দপ্রণমিতে॥
নয়নের জলে শ্যামানন্দে সিক্ত কৈলা।
দেখি-প্রেমাবেশে সবে অধৈর্য্য হইল॥

আচার্য্য প্রভু এইরূপ স্নেহ সম্ভাষা করিয়া শ্যামানন্দের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামানন্দ সকল কথা বলিলেন। অনন্তর ঠাকুর মহাশয় সমাগত বৈষ্ণব মহান্তগণের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীদাস, গোকুলানন্দ ব্যাসাচার্য্য, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতির সহিত মিলনে যে আনন্দের মনোমদ তরঙ্গ উঠিল, তাহার তুলনা নাই, ভাষা সে ভাব পরিস্ফুট করিতে অক্ষম। রসিকানন্দাদির সহিতও ভক্তগণের পরস্পর আলাপ পরিচয় হইয়া গেল। সকলেই প্রাণে প্রাণে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। শ্যামানন্দের থাকিবার জন্য একটী দিব্য বাসা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর ঠাকুর মহাশয় রসিকানন্দকে স্নেহসম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—"ওহে বাপু! তুমি আমাদের নিজের লোক, যাহাতে এই গুরুতর কার্য্যটী সুসম্পন্ন হয়, তাহা তোমায় করিতে হইবে।"

রসিক বিনীতভাবে সে আদেশ মান্য করিয়া লইলেন। অনন্তর আচার্য্য প্রভুর অনুজ্ঞাক্রমে গোবিন্দ কবিরাজ আসিয়া শ্যামানন্দকে শ্রীবিগ্রহ সমূহ দর্শন করাইতে লইয়া গেলেন। শ্যামানন্দ সে অখিল রসামৃত-সিন্ধু-শ্রীগৌর সুধাকরের মাধুরীময়ী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া একবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। নয়নে অশ্রু-ধারা বহিতে লাগিল। প্রেমাবেশে অবশাঙ্গ—সর্ব্বাঙ্গে পুলক-কদম্ব বিকসিত। তিনি ভূমিতে পড়িয়া বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আর পঞ্চ-শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন। এদিকে রসিকানন্দ,

পুরুষোত্তম, কিশোরাদি শ্যামানন্দের শিষ্যগণ, দেশ হইতে মহোৎসবের জন্য যে সকল দ্রব্য সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা-ভাণ্ডারে পাঠাইয়াদিলেন। সঙ্গে যে সকল লোক আসিয়াছিল, তাহাদের জন্য বাসা নির্দ্দেশ করিয়াদিলেন। রসিক এইরূপে নানাস্থানে নানা কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

"এইরূপে নানাস্থানে করে সমাধান।
শ্যামানন্দ শিষ্য সবে বৈষ্ণবের প্রাণ॥" নঃ বিঃ

দলে দলে মহান্তগণ আসিয়া মহোৎসবে যোগদান করিলেন। শ্রীজাহ্নবী দেবী, শান্তিপুর হইতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র প্রভু গোপাল, অম্বিকা হইতে ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য, নবদ্বীপ হইতে শ্রীবাসের ভ্রাতা শ্রীপতি ও শ্রীনিধি, শ্রীখণ্ড হইতে রঘুনন্দন, কাটোয়ার যদুনন্দন প্রভৃতি বহুস্থান হইতে বহু মহান্ত, শিষ্য-মণ্ডলী লইয়া উপনীত হইলেন। শ্যামানন্দ স্বয়ং ঠাকুর হৃদয়চৈতন্যের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। দেখিতে দেখিতে বৈষ্ণব, মহান্ত ও দর্শক মণ্ডলীতে খেতরী পূর্ণ হইয়া উঠিল, চারিদিগেই গান বাদ্যের কল-কোলাহলে ও অহোরহঃ সঙ্কীর্ত্তনের মধুররোলে আকাশ-অবনী ভরিয়া উঠিল। শঙ্খ ঘণ্টার মঙ্গলধ্বনি, সহস্র সহস্র মনুষ্য কণ্ঠের আনন্দধ্বনির সহিত মিলিয়া মিশিয়া বায়ু-বিক্ষুব্ধ সাগর-কল্লোল অপেক্ষাও গম্ভীর বোধ হইল। শুভক্ষণে আচার্য্য প্রভু যথা শাস্ত্র-বিধানে শ্রীবিগ্রহ সকলের অভিষেক সম্পাদন করিলেন। শ্রীবিগ্রহসকল সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন, ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই প্রেমমাখা সুধা-মধুর অভিনব গরাণহাটী সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এই সময়ে এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হইল। সকলেই দিব্য-নয়নে দেখিতে পাইলেন—খেতরী যেন শ্রীনবদ্বীপের শোভা সম্ভারে উদ্ভাসিত

হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়াছেন, শ্রীগৌর নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাদি যেন প্রকট হইয়া তাঁহাদের মধ্যে, নৃত্য করিতেছেন।

"শ্রীঅচ্যুতানন্দ আদি করয়ে নর্ত্তন।
তা' সভা লইয়া নাচে শচীর নন্দন॥
নিত্যানন্দ প্রভু মহা মনের উল্লাসে।
করেন নর্ত্তন প্রিয় নরোত্তম পাশে॥
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নাচে মহামত্ত হৈয়া।
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ আদি লৈয়া॥" নঃ বিঃ

এইরূপে গোলোকের আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে সহসা সকলের বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল। তখন "কি দেখিলাম" বলিয়া ধূলায় লুটাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন পর্য্যন্ত শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, গোকুলানন্দ, রামচন্দ্র রসিক মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহারা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার পর আবার হোলী ক্রীড়ার আয়োজন করিলেন। সে কৌতুক আরও অপূর্ব্ব! শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীঅঙ্গ ফাগুচূর্ণে রঞ্জিত হইল। পরস্পর অঙ্গে সেই ফাগুচূর্ণ বিলেপ করিতে লাগিলেন।

"কিবা পরস্পর ফাগু খেলায় বিহ্বল।
কিবা ফাগুময় অঙ্গ করে ঝলমল॥
কিবা ফাগু ক্রীড়া গীত গায়েন প্রচুর।
নানা বাদ্যবায় কিবা শব্দ সুমধুর॥
কহিতে কি জানি সে অদ্ভুত সবরীত।
গীত বাদ্য শ্রবণে ব্রহ্মাদি বিমোহিত॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তম শ্যামানন্দ।
গণ সহ বিহ্বল, পাইয়া মহানন্দ॥" ভঃ রঃ॥

অনন্তর সকলে মহাপ্রসাদ ভোজনে উপবেশন করিলেন। একএক-বারে সহস্র সহস্র কণ্ঠে হরিধ্বনি হইতে লাগিল। ফলতঃ সে ভোজনানন্দ ব্যাপার প্রকৃতই ভুবনে অতুলনীয়। আচার্য্যপ্রভু শ্যামানন্দকে লইয়া সর্ব্বত্রই তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।—

"শ্রীআচার্য্যঠাকুর শ্রীশ্যামানন্দে লৈয়া।
ভুঞ্জায়েন অনেক লোকেরে যত্ন পায়া॥

সকলেই পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করিয়া আচমন করিলেন। চারিদিকেই শ্রীঠাকুর মহাশয়ের নামে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। মহোৎসব সাঙ্গ হইল। ক্রমে ক্রমে সকলেই বিদায় হইলেন। শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের উপদেশানুসারে বস্ত্র, মুদ্রা ও তৈজসাদি দ্বারা মহান্তগণের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করা হইল। বিদায়ের কালে পরস্পর এরূপ কাতর হইলেন, তাহা দর্শন করিলে দারু-শিলাও দ্রবীভূত হইয়া যায়। ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য বিদায়ের কালে আচার্য্যপ্রভুকে বলিলেন—"বৎস! মধ্যে মধ্যে অম্বিকা যাইয়া আমার আনন্দ বিধান করিবে, আর আমার শ্যামানন্দকে তুমি আপনার বলিয়া জানিবে। আচার্য্যপ্রভু ধীর মধুর বাক্যে কহিলেন—

"—শ্যামানন্দ মোর প্রাণ।
শ্যামানন্দ প্রতি মোর নাহি অন্যজ্ঞান॥
নরোত্তম রামচন্দ্র আদি যতজন।
গণ সহ শ্যামানন্দ সবার জীবন॥ নঃ বিঃ॥

ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দকে অশেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া শিষ্যগণ সহ অম্বিকায় প্রত্যাগমন করিলেন। সকলে চলিয়া যাইবার পরও

শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ নিজগণ সহ কিছুদিন খেতরীতে রহিলেন। এই মহোৎসব ব্যাপারে গৌড় দেশ ধন্য হইল। বহুশত পাষণ্ডব্যক্তি ভক্তির অমল-প্রবাহে নিমগ্ন হইয়া পবিত্র জীবন লাভ করিল এবং নরোত্তমের ভক্তিময় যশঃ-সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত প্রমোদিত হইয়া উঠিল; সে সৌরভ, শ্রীবৃন্দাবনবাসী ভক্তগণের প্রাণেও প্রীতি সঞ্চার করিল।

অনন্তর আচার্য্যপ্রভু, ঠাকুর মহাশয়ের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন—কল্য প্রভাতে শ্যামানন্দ সমভিব্যাহারে বুধুরী গমন করিব। পরে তথা হইতে যাজিগ্রাম যাইব। আর—

"শ্যামানন্দ নবদ্বীপ অম্বিকা হইয়া।
রহিবে ধারেন্দাবাহাদুরপুরে গিয়া॥
সে সকল দেশে করি ভক্তির প্রচার।
পত্রী দ্বারে শীঘ্র পাঠাবেন সমাচার॥ নঃ বিঃ।"

এই কথা শুনিয়া ঠাকুর মহাশয় মহা অধৈর্য্য হইলেন। রাজা সন্তোষ তাঁহাদের গমনের সমস্ত আয়োজন করিলেন।—

"শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্গে যাইবেক যাহা।
শ্রীরসিকানন্দে সমর্পণ কৈল তাহা॥
শ্রীআচার্য্য-ঠাকুরের সঙ্গে যাহা চাই।
তাহা দিলা কর্ণপূর কবিরাজ ঠাঞি॥ নঃ বিঃ।

আচার্য্যপ্রভু ও শ্যামানন্দ বিদায়-প্রণাম করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরে গমন করিলেন। রাজা সন্তোষ এবং দেশের গণ্যমান্য বহুতর ব্যক্তি তাঁহাদের গমনে ব্যাকুল হইয়া তথায় সমবেত হইলেন। শ্যামানন্দ পুলকাশ্রু পরিসিক্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহগণকে প্রণাম করিলেন। পূজারী প্রসাদী মাল্য ও বস্ত্র লইয়া আচার্য্যপ্রভুর সম্মুখে রাখিলেন।

আচার্য্যপ্রভু সকলকে বিতরণ করিয়া, অবশেষে আপনিও মস্তকে ধারণ করিলেন। অনন্তর সকলে ঠাকুর মহাশয়কে প্রবোধ দিয়া খর-স্রোতা পদ্মাবতীর তীরে উপনীত হইলেন। নৌকা সজ্জিত ছিল; সকলেই তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু সে সময় শ্যামানন্দ ও নরোত্তম ঠাকুর এমনই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, কেহ কাহাকে আর ছাড়িতে চাহেন না।

"শ্যামানন্দ ভাসে দুটীনয়নের জলে।
নরোত্তম কান্দে শ্যামানন্দ করি কোলে॥
পরস্পর ঐছে সবে করয়ে ক্রন্দন।
সে ক্রন্দন শুনি ধৈর্য্য ধরে কে এমন॥
কতক্ষণে সবে প্রবোধিলা রামচন্দ্র।
গণ সহ নৌকায় চড়িলা শ্যামানন্দ॥
কর্ণধার নৌকা চালাইলা শীঘ্র করি।
পদ্মা পার হৈয়া শীঘ্র গেলেন বুধুরী॥ নঃ বিঃ।

অনন্তর বাজিগ্রামে যাইয়া শ্যামানন্দ স্বগণ সহ আচার্য্য প্রভুর নিকট বিদায় হইলেন। পরে অম্বিকা হইয়া ধারেন্দায় গমন করিলেন। রসিকানন্দ রয়ণীতে চলিয়া গেলেন।

—:*:—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—:*:—

শ্রীগোপীবল্লভপুর প্রকাশ।

রসিকানন্দের ভক্তি-চেষ্টা অতীব অদ্ভুত। তিনি অহোরাত্র কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ সাধন করেন। গৃহ-কর্ম্মে

একবারে উদাসীন। সর্ব্বদা—সাধু সেবা ও সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-কথালাপে ব্যাপৃত থাকেন। জাতিবুদ্ধি নাই, যাঁহার কণ্ঠে মালা, ললাটে তিলক দর্শন করেন, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণের অতিপ্রিয়জনবোধে যথোচিত পূজা করেন, তাঁহার চরণোদক পান করিয়া, তাঁহার ভুক্তাবশেষ ভোজন করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করেন। রসিকের পত্নী শ্রীমতী ইচ্ছাদেবীও স্বহস্তে বৈষ্ণবের সেবা-পরিচর্য্যা করেন। বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহাদের এই অসামান্য বিশ্বাস ও ভক্তি দর্শন করিয়া, পরিজনের মধ্যে সকলেই মহারুষ্ট হইলেন। রাজা অচ্যুত তখন নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। রসিকের অন্যান্য ভ্রাতৃগণের উপরেই রাজ কার্য্য পরিচালনের ভার পড়িয়াছে। তাঁহারা লোক-নিন্দা ও কলঙ্কের ভয়ে রসিকের আচরণের ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। রসিক পাছে বৈষ্ণবগণের অসম্মান ও নিন্দা হয়, এই আশঙ্কায় ভ্রাতৃগণের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাড়ী করিবার মনস্থ করিলেন।

রসিকানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ সুবর্ণরেখা নদীর তীরে কাশীপুর নামে এক গ্রাম বসাইয়াছিলেন; কিন্তু গ্রামখানি তেমন সমৃদ্ধিশালী করিতে পারেন নাই। অল্পদিনের মধ্যেই তাহা আবার জঙ্গলে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। রসিকানন্দ রয়ণীর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্র-পরিজন সহ কাশীপুরে আসিয়া বাস করিলেন। কুবেরের ন্যায় বিষয়বৈভব, রসিক তাহার তিলমাত্র গ্রহণ করিলেন না। অথচ কাশীপুরে দিব্য বাড়ী তৈয়ার করিয়া নিত্য শত শত বৈষ্ণব সেবা করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই কাশীপুর বহুজনপূর্ণ এক দিব্য নগরে পরিণত হইল। এই সময়ে শ্যামানন্দপ্রভু ধারেন্দা হইতে রসিকের নূতন বাটীতে উপনীত হইলেন। রসিক শ্যামানন্দের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া সমস্ত কাহিনী নিবেদন করিলেন।

শ্যামানন্দ রসিককে আশীর্ব্বাদ ও আশ্বাস প্রদান করিয়া দিনযামিনী কৃষ্ণকথারঙ্গে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রসিকের কুলদেবতা এক শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। তাহা ময়ূরভঞ্জের রাজা বলপূর্ব্বক লইয়া যান। রসিক রাজার নিকট হইতে সেই শ্রীবিগ্রহ আনয়ন করিয়া এই নূতন বাড়ীতেই রাখিয়াছেন। রসিক শ্যামানন্দকে সেই শ্রীবিগ্রহ দেখাইলেন। শ্যামানন্দ আনন্দ-প্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন—"রসিক! আজ হইতে এই শ্রীবিগ্রহের নাম "শ্রীগোপীবল্লভ রায়" এবং এই গ্রামের নামও শ্রীগোপীবল্লভপুর রাখা হইল। এই গ্রামে শ্রীগোবিন্দের অনেক লীলা প্রকটিত হইবে। সুতরাং এই গ্রাম বৃন্দাবনের ন্যায় পরম পবিত্র তীর্থ-স্বরূপ হইবে। আর আজ হইতে এই গ্রামের অধিকারিণী শ্রীশ্যামদাসী ঠাকুরাণী হইলেন। ইহাঁর দ্বারাই শ্রীগোপীবল্লভজীউর সেবা প্রকাশ হইবে। আর রসিক! তুমি জীবের উদ্ধারের জন্য দেশে দেশে আমার সঙ্গে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিবে।"

এই বলিয়া শ্যামানন্দদেব—

"শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্যামদাসী স্থানে।
সাধু সেবা কৃষ্ণ সেবা কৈল সমর্পণে॥
সেই দিন হৈতে সেবা বাড়ে দিনে দিনে।
মহাদীপ্ত স্থান হৈল আজ্ঞা পরক্ষণে॥" রঃ মঃ।

ইহার পর একদিন শ্যামানন্দদেব রসিকের হাতে ধরিয়া বলিলেন—"বৎস! আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হইবে।"

রসিক করযোড়ে বিনীত ভাবে কহিলেন—"প্রভো! এ কথা বলিতেছেন কেন? আপনার শ্রীচরণে আমার অদেয় কি আছে? আপনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, আমি সেই দণ্ডে তাহা প্রাণপণে সম্পন্ন করিব।"

শ্যামানন্দ বাষ্প-বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন:—

"এই ভিক্ষা, সব জীবে কর পরিত্রাণ।
সবাকারে দেহ হরেকৃষ্ণ ষোল নাম॥
ব্রহ্ম, ক্ষেত্রী, বৈশ্য, শূদ্র যত যতজন।
চণ্ডাল, পুকষ হূন আছে যতজন॥
সবাকারে কর কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি দান।
তোমা স্থানে এই ভিক্ষা মাগিনু নিদান॥
কিবা রাজা কিবা প্রজা কিবা সাধুজন।
কিবা শিশু কিবা বৃদ্ধ কিবা নারীগণ॥
সবা স্থানে আপনি ফিরিবে নিরন্তর।
হরিনাম গ্রহণ করাবে ঘরে ঘর॥" রঃ মঃ।

রসিক অবনত মস্তকে গুরু আজ্ঞা স্বীকার করিলেন। শ্যামানন্দ তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া শক্তি-সঞ্চারণ করিলেন। অনন্তর শ্যামানন্দ তথা হইতে চাকুলিয়ায় দামোদরের গৃহে উপনীত হইলেন। রসিকের ন্যায় দামোদরকেও ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবোদ্ধার করিতে আদেশ করিলেন। এই হইতে উৎকলে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের এক নূতন তরঙ্গ উঠিল। দিগন্তব্যাপী হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দময় উৎসব আরম্ভ হইল। হিংসা, দ্বেষ, পাশবাচার পরিত্যাগ করিয়া শত শত নর-নারী সেই উৎসবে যোগদান করিয়া ভক্তেরপ্রাণ ভগবানের নামে নাচিয়া গাহিয়া প্রেমের আবেশে কাঁদিতে শিখিল। প্রভু নিত্যানন্দ যেমন নদীয়ার ঘরে ঘরে শ্রীহরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন, রসিক-দামোদরও সেই মধুর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উৎকলের ঘরে ঘরে শ্রীহরিনামের অমৃত-ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ রসিক এই দশজনকে শিষ্য করিলেন। যথা, কালিন্দী, ভক্তদাস, শ্যাম-

গোপাল, শ্যামনারায়ণ, রামকৃষ্ণ, পরমানন্দ, ভূধর, গৌরগোপাল, গোপীনাথ ও গোকুল।

যে সময়ে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ উৎকলে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করেন, সে সময়ে উৎকলের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তখন পাঠানগণ উড়িষ্যার গড়জাত মহলে প্রবল অত্যাচার করিতেছিল। তাহাদের অত্যাচারে প্রাণের ভয়ে শত শত হিন্দু, জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান হইতেছিল। আবার উড়িষ্যাবাসীরাও তেমন শিষ্ট, শান্ত, ধর্ম্মভীরু ছিল না। তাহাদের মতিগতি ও আচার-ব্যবহার কিরূপ ভয়ানক ছিল, 'রসিক মঙ্গল' গ্রন্থে তাহা বর্ণিত আছে। যথা—

"কিবা রাজা কিবা প্রজা সবে দুষ্ট মতি।
উড়িষ্যা দেশেতে বৈসে যত যত জাতি॥
সবে জীব হত্যা করে হয়ে অচেতন।
দাবাদি বোদা পোড় কাটে সর্ব্বজন॥
তার মধ্যে মহতাদি আছে যতজন।
নানা অবিদ্যাতে রত না যায় কথন॥
অল্প দ্রব্য লোভে প্রাণী হিংসা করে।
শত শত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু মারে॥
সাধু জন হিংসা করি যত দ্রব্য আনে।
মদ মাংস খায় আর দেই বেশ্যাগণে॥
নানা পূজা করে তারা করিয়া স্থাপন।
না শুনয়ে হরি কথা না শুনে কীর্ত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তন শুনিলে মারিতে সবে ধায়।
এ গুলার শব্দে লক্ষ্মী দেশ ছাড়ি যায়॥

বৈষ্ণব দেখিলে বলে এ গুলা তস্কর।
গ্রাম হৈতে খেদাড়িয়া রাখে তেপান্তর ॥” ইত্যাদি।

শ্যামানন্দ ও রসিক এইরূপ পশু-প্রকৃতি দুর্দ্দান্ত উড়িষ্যাবাসীর মধ্যে ভক্তি-ধর্ম্মের যে মনোমদ তরঙ্গ উঠাইলেন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া অনেকেই নবজীবন লাভ করিল। শ্যামানন্দ ও রসিকের চরণ-রেণু স্পর্শে পিশাচ স্বভাব পাষণ্ডগণও পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপে লোকের নিকট পূজা পাইবার যোগ্য হইল। এইরূপ ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে রসিকানন্দ ধারেন্দায় উপনীত হইলেন। সেই গ্রামে সদ্গোপবংশীয় মহাদুর্দ্দান্ত একঘর জমিদার বাস করেন। ভীম ও শ্রীকর নামে তাঁহারা দুই সহোদর। জগাই-মাধাই অপেক্ষাও বুঝি ইহারা মহা দুরাচার—ঘোর পাষণ্ড! রসিকানন্দ তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত মহা-ব্যাকুল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাঁহাদের জন্য কাতর প্রাণে করুণা ভিক্ষা চাহিলেন। যাঁহারা আপনার দুঃখ না ভাবিয়া অপরের দুঃখে ব্যথিত হন—অপরের দুঃখ-মোচনের জন্য নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করেন, জগতে তাঁহারাই মহাপুরুষ। এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাবে জগতে এক মহাযুগান্তর উপস্থিত হয়।

ধারেন্দায় রসময়, বংশী ও মথুর এই তিন সহোদর পূর্ব্বে দামোদর দাসের নিকট উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহারা পূর্ব্বোক্ত ভীমের দৌহিত্র তিন ভ্রাতার মধ্যে রসময় ও বংশী পরম বৈষ্ণব। রসিকানন্দ প্রথমতঃ তাঁহাদের বাটীতে গমন করিলেন। রসিকের আগমনে তাঁহাদের আনন্দের আর পারাসিমা রহিল না।

এই স্থানে ঠাকুর হৃদয়-চৈতন্যের শিষ্য তুলসীদাস নামে এক তরুণ বয়স্ক বালকের সহিত রসিকের মিলন হয়। ইনি শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য ঠাকুর গোপাল দাসের পুত্র। নিবাস গঙ্গাগ্রাম।

ইহারা পিতা পুত্রেই সুগায়ক এবং সুকণ্ঠ। শ্যামানন্দ যত্ন পূর্ব্বক ইহাদিগকে ধারেন্দায় আনিয়া বাস করাইয়াছিলেন। রসিক সেই কিন্নর-কণ্ঠ তুলসীদাসকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিবানিশি কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইলেন।

একদিন রসিক নিজগণ সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভীম-শ্রীকরের সভায় গমন করিলেন। ভীম-শ্রীকর এই ব্যাপার দর্শন করিয়া একবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। রসিককে নানা প্রকারে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—"ছি! ছি! রসিক তুমি রাজা অচ্যুতের ছেলে, তোমার এমন কুবুদ্ধি কেন? বছর কুড়ি বয়স, এখনও বালক কোথায় লেখা পড়া শিখিবে, বাপের নাম-পাট বজায় রাখিবে। তা' না হ'য়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া "বোষ্টম" গুলার সঙ্গে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চ! আরে ছি! অচ্যুতের কুলে এমন কুলাঙ্গার কেন জন্মেছিলে? দেখা হো'ল, ভালই। এখন বলি শুন এসব অনাচার গুলো ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতে যাও। ভায়েদের সঙ্গে মিলে মিশে বিষয় কর্ম্ম দেখগে। তোমার মত রাজার ছেলের এসব কাজ শোভা পায় না।"

রসিক এই দুর্ব্বচন শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। তিনি বিনয়-মধুর বাক্যে বলিলেন—"মহাশয় আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমি তো কিছুই অন্যায় কর্ম্ম করি নাই! আপনি পণ্ডিত-সভা করিয়া বিচার করুন, বিচারে যে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তিত হইবে, আপনি কি আমি সকলে সেই মতই আচরণ করিব।"

রসিকের কথায় ভীম-শ্রীকর মহাসন্তুষ্ট হইলেন। দিন ধার্য্য করিয়া দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। জানকী, হরিচন্দন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণও সেই সভায় আসিয়া যোগ

দান করিলেন। বিচার আরম্ভ হইল। পণ্ডিতগণ যে যে, তর্কজাল বিস্তার করিলেন, রসিক শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলেন। কিন্তু রসিকের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিতে আর কাহারও সাধ্য হইল না। তখন পণ্ডিতগণ অকপটে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া রসিকের বাক্যই ধ্রুব সত্য বলিয়া অনুমোদন করিলেন। ইহাতে ভীম-শ্রীকরের মতিগতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহারা সগোষ্ঠী রসিকানন্দের শ্রীচরণে শরণ লইলেন।—

"নিজ কর্ণে শুনি ভীম-শ্রীকর আনন্দে।
সবংশে শরণ লৈলা শ্রীরসিকানন্দে॥
সেই দুই ভাই হৈলে অনন্যশরণ।
সবাই ভজিল, দোঁহে কৃষ্ণে চরণ॥" রঃ মঃ।

এই ঘটনার পরে ধারেন্দায় এক মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তনের মধুররোল উত্থিত হইল। যাহারা দুঃখের নিদাঘ-দাহে দগ্ধ হইয়া আকুল প্রাণে দিনপাত করিতেছিল, অকস্মাৎ তাহারা শান্তির সুখ-শীতল ছায়া-কুঞ্জ দেখিতে পাইয়া প্রাণে শীতলতা অনুভব করিল এবং দলে দলে নর-নারী রসিকের চরণ-প্রান্তে আসিয়া মস্তক লুটাইতে লাগিল।

শ্যামানন্দদেব রসিকানন্দে শক্তি সঞ্চার করিয়া সর্ব্বতোভাবে আপনার ন্যায় শক্তিধর করিলেন। সে শক্তির দীপ্ত-কিরণে রসিক-পঙ্কজ প্রস্ফুটিত হইল—তাঁহার ভক্তি-সৌরভে সমগ্র উৎকল প্রদেশ, এমন কি গৌড় মণ্ডল পর্য্যন্ত প্রমোদিত হইয়া উঠিল। তাঁহার স্পর্শ-শীতল প্রেমের হিল্লোলে ত্রিতাপ-তাপিত অসংখ্য নর-নারী মর্ম্মদাহী প্রাণের জ্বালা জুড়াইল।

রসিকানন্দ ধারেন্দায় অবস্থানকালে শ্রীগোপীবল্লভরায়ের পার্শ্বে

শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। এই কথা শুনিয়া রসময় ও বংশীদাস প্রভৃতি ভক্তগণ ধারেন্দায় শ্রীগোপীবল্লভরায়ের বিবাহ-মহোৎসব সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তখনই কারিকর আনাইয়া ঠাকুরাণীর শ্রীবিগ্রহ প্রস্তুত করান হইল। মহোৎসবের মহাধূম পড়িয়া গেল। ভক্তগণ মিলিয়া বিবিধ বাদ্যোদ্যমের সহিত গোপীবল্লভপুর হইতে দিব্যবস্ত্র বিভূষিত শ্রীগোপীবল্লভরায়কে দোলায় আরোহণ করাইয়া, ধারেন্দায় আনয়ন করিলেন। শুভ লগ্নে শ্রীগোপীবল্লভজীউর শুভাধিবাস হইল—শুভক্ষণে শ্রীশ্রীযুগল-মিলন সম্পাদিত হইয়া গেল। নয়নানন্দ-বর্দ্ধন সে অপূর্ব্ব মিলন-মাধুরী সন্দর্শন করিয়া ভক্তগণ প্রেমানন্দে অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহোৎসবান্তে রসিকানন্দ মহা সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীযুগল-বিগ্রহ সঙ্গে লইয়া গোপীবল্লভপুরে আসিলেন। ভীম, শ্রীকর, রসময় প্রভৃতি ভক্তগণ যৌতুক স্বরূপ বিবিধ দ্রব্য পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

শ্রীভগবানের লীলাভূমি শ্রীনীলাচলে অনন্ত প্রেমাম্বুনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রেমভক্তির যে অফুরন্ত মধুর তরঙ্গ তরঙ্গায়িত করিয়াছিলেন, শ্যামানন্দ দ্বারা তিনি সেই তরঙ্গকে অনন্ত বিস্তার করিয়া উড়িষ্যার ঊষর-দেশকে প্লাবিত করিলেন। উড়িষ্যার রাজ-প্রাসাদ হইতে

বিজন বনোপান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে পর্য্যন্ত সে তরঙ্গের আঘাত লাগিল। অসভ্য বর্ব্বর চণ্ডাল, হূন, পুক্কষাদি হইতে বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত এই একই তরঙ্গের তালে তালে নাচিল। হিন্দু-ধর্ম্মবিরোধী অনেক মুসলমানও ভক্তির এই সর্ব্ববিজয়িনী শক্তির নিকট স্বীয় জাতীয় ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীহরিনাম গানে বিভোর হইল।

শ্যামানন্দ এইরূপে একে সহস্র হইয়া সর্ব্বত্রই ভক্তির বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিলেন। তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে বড়-বলরামপুরে উপনীত হইলেন। তথায় গোপীনাথ, জগন্নাথ অক্রূর, শ্রীহরি, রাধাবল্লভ, বালকদাসাদি বহুব্যক্তিকে কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। এইস্থান হইতে শ্যামানন্দ রসিককে আহ্বান করিয়া একখানি পত্র লোকদ্বারা পাঠাইয়া দিলেন। রসিক ভোজনে বসিয়াছেন, প্রথম গ্রাস বদনে তুলিয়া দ্বিতীয় গ্রাস হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, এমন সময় পত্র লইয়া লোক পঁহুছিল। রসিক পত্র পাঠ করিয়া অবগত হইলেন যে, পত্র পাঠ মাত্র তাঁহাকে বলরামপুর যাত্রা করিতে হইবে। রসিকের হাতের গ্রাস আর মুখে উঠিল না। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সুবর্ণরেখায় গিয়া আচমন করিলেন। ধন্য! রসিক! ধন্য তোমার গুরু-ভক্তি! তুমি মুখের গ্রাস ফেলিয়া আজ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিলে। এরূপ গুরু-ভক্তি না হইলে কি তোমাতে এত মহিমা প্রকাশ পায়?

রসিক হিংস্রজন্তুপূর্ণ দুর্গম বন-পথ দিয়া একাকী বলরামপুরে উপনীত হইলেন। শ্যামানন্দ, রসিককে স্নেহ ভরে গাঢ়ালিঙ্গন করিলেন। বহুক্ষণ পরে রসিকের সঙ্গী ভৃত্যগণ তথায় পঁহুছিল। তাহাদের মুখে রসিকের আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্যামানন্দ বড়ই ব্যথিত হইলেন। তখনই রসিকের স্নান ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভোজনান্তে রসিক শ্যামানন্দের চরণ প্রান্তে আসিয়া উপবেশন করিলেন। শ্যামানন্দ স্নেহ-মধুর বাক্যে বলিলেন—"বৎস! শুনিয়া সুখী হইলাম, পাষণ্ড-প্রধান ধারেন্দা গ্রাম তোমার কৃপায় বৈষ্ণবতার তীর্থ স্বরূপ হইয়াছে। এক্ষণে এই অজ্ঞ অরণ্যবাসীদিগের উদ্ধারের চেষ্টা কর। বড়কোলা গ্রামে আগামী বৈশাখ মাসে প্রভুর পঞ্চম দোলোৎসব করিবার ইচ্ছা করিতেছি। মহোৎসব যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তোমাকে তাহার সমুদায় আয়োজন করিতে হইবে।"

রসিকানন্দ শ্রীগুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ধারেন্দা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্যামানন্দ বড়কোলাতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞা মাত্র তশ শত লোক দ্বারা এক সুন্দর মণ্ডপ প্রস্তুত হইল। চন্দ্রাতপ, পতাকা, পত্র-পল্লব ও পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সেই স্থানকে পরিপাটিরূপে সাজান হইল। রসিক ধারেন্দার ভীম শ্রীকরের বাড়ী হইতে শ্রীশ্যামরায় বিগ্রহকে আনয়ন করিলেন। শঙ্খ-ঘণ্টা-দুন্দুভি ধ্বনিতে চারি দিক নিনাদিত হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র লোকের কণ্ঠ-কোলাহলে ও শত শত কীর্ত্তন দলের মৃদঙ্গ ও করতালের শব্দে মিলিত হইয়া সাগর কল্লোলের ন্যায় দূরে—অতিদূরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই দোলযাত্রা দেখিতে আসিতে লাগিল। অনেক রাজা জমিদারও সে উৎসবে যোগ দান করিলেন। এমন কি, মেদিনীপুরের সুবাদারও সেই মহোৎসব দর্শনের নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন। সুতরাং এই দোলোৎসব কিরূপ বিরাট ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বিজ্ঞ পাঠকবর্গই বিবেচনা করুন। সে মহোৎসবে দেবতাগণ পর্য্যন্ত যোগদান করিয়াছিলেন। যথা—

"স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল পূরিল জয়কার।
দুন্দুভি শবদে কিছু না শুনিয়ে আর॥
দেবলোক নরলোক একত্র হইয়া।
নাচেন আনন্দে সুখে মণ্ডলী করিয়া॥
আনন্দে মজিল সবে নাহি দেহ জ্ঞান।
বৈকুণ্ঠ অধিক হৈল সেই সব স্থান॥ রঃ মঃ।

আবিরের অরুণ-রাগে সকলের দেহ রঞ্জিত হইয়া গেল—বৃক্ষ-বল্লরী পর্য্যন্ত অরুণিম হইয়া উঠিল। তাহার পর প্রসাদ ভোজন! সে আনন্দময় ব্যাপারের কি তুলনা আছে? এই দিনেই রসময় ও বংশীদাসের অনুরোধে রাজা হরিচন্দনের ভ্রাতা বিশ্বনাথ ভূঞ্যাকে রসিক কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং বিশ্বনাথ নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার নাম "শ্যাম-মনোহর" রাখেন। শ্যামমনোহর সঙ্গীতরসবেত্তা ও সুপণ্ডিত। ইনি শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ী বহুব্যক্তিকে শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

মহোৎসবান্তে শ্যামানন্দ ও রসিক শিষ্যগণ সঙ্গে ধারেন্দার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে সেই দেশের একজন মুসলমান রাজা বহু সমাদর পূর্ব্বক শ্যামানন্দ ও রসিককে আহ্বান করিয়া পুনরায় আর একটী মহোৎসব করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা রাজার আদেশ অন্যথা করিতে না পারিয়া মেদিনীপুর-আলমগঞ্জে তিন দিন-ব্যাপী, শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন ও মহোৎসব করিলেন। যবনরাজ সে মহোৎসবের সমুদায় ব্যয়ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং কীর্ত্তন-মহোৎসব দর্শন করিয়া অপার আনন্দানুভব করিলেন।—

"হেন শ্যামানন্দ রসিকের পরিতাপ।
যবনেও যাঁর নাম সদা করে জপ॥" রঃ মঃ

অনন্তর শ্যামানন্দ ও রসিক ধারেন্দায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের শুভাগমনে ধারেন্দা ভক্তির আনন্দময় কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তথায় শ্যামানন্দ, চিন্তামণি, মথুরা, মুকুন্দ, শ্যামসুন্দর, কানুদাস, উদ্ধব, অক্রূর প্রভৃতি বহু ব্যক্তিকে শিষ্য করিলেন।

একদা রসময়, বংশী, ভীম ও শ্রীকর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ শ্যামানন্দের স্থানে করযোড়ে বলিলেন—'প্রভো! আপনি যদি এ দাসাধমগণের অপরাধ না ল'ন, তাহা হইলে আপনার শ্রীচরণে আমাদের মনের অভিলাষ ব্যক্ত করি।"

শ্যামানন্দ বলিলেন—"সঙ্কোচ কি? নির্ভয়ে বল। তোমরা কি আমার পর?॥

তখন ভীম শ্রীকর বলিলেন—"প্রভু! আপনি এতকাল তীর্থ পর্য্যটন ও জীবোদ্ধার করিলেন এখন কিছুকাল সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করুণ, ইহাই আমাদের অভিলাষ।"

শ্যামানন্দ বলিলেন—বৎসগণ! সংসারের প্রলোভন জালে মন একবার আবদ্ধ হইলে ভগবচ্চরণ চিন্তা একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠে। তাই, সংসারকে আমি বড় ভয় করি।"

শিষ্যগণ শ্যামানন্দ দেবের চরণে ধরিয়া বহু অনুনয় ও অনুরোধ করিলেন। অবশেষে তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে শ্যামানন্দ দেব হাসিয়া বলিলেন—"ভাল! তোমারা যাহা করিলে সুখী হও, আমরা তাহাই করিব। তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

এই সময়ে শ্যামানন্দ, রসিককে গোপীবল্লভপুরে যাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। পাছে রসিক এই বিবাহ উপলক্ষে একটা মহাঘটা করিয়া বসেন, বোধ হয়, এই মনে করিয়াই রসিককে গোপীবল্লভপুরে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে রসময় শ্রীকর প্রভৃতির চেষ্টায় বলরামপুর

নিবাসী ভাগ্যবান শ্রীজগন্নাথ দাসের কন্যা শ্রীমতী শ্যামাপ্রিয়ার সহিত শ্যামানন্দ দেবের শুভ পরিনয় সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর শ্যামানন্দদেব শ্রীঠকুরাণীর সহিত কিছু দিন ধারেন্দায় চিন্তামণির বাড়ীতে রহিলেন। পরে তথা হইতে রাধানগরে গিয়া গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ—

ভক্তি-প্রচার

দোল যাত্রার পর দেশময় এক মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল। শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের প্রকাশ কাহিনী তখন ঘাটে মাঠে, মজলিসে লোকের নিত্য জল্পনার বিষয় হইল। এই সময়ে ঠকুর হৃদয় চৈতন্য তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সশিষ্য ধারেন্দায় আগমন করিলেন। ঠাকুরের শুভাগমন শ্রবণে শ্যামানন্দ, রসিক ও দামোদর প্রভৃতি ধারেন্দায় উপনীত হইলেন। তাঁহদিগকে দর্শন করিয়া ঠাকুর হৃদয় চৈতন্যের স্নেহের বাঁধ ভাসিয়া গেল। তিনি তাঁহাদিগকে হৃদয়ে ধরিয়া স্নেহাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর মধুর বাক্যে কহিলেন—

"চৈতন্যের প্রেমভক্তি হরেকৃষ্ণ নাম।
উৎকলের সর্ব্বজীবে করহ প্রদান॥
এ গোষ্ঠী দেখিয়া বড় হইনু উল্লাস।
নরবধি কর কৃষ্ণ ভক্তির প্রকাশ॥" রঃ রঃ।

ঠাকুর, রসিক ও দামোদরের প্রতিও যথেষ্ট কৃপা প্রদর্শন করিলেন। এইরূপে শিষ্যানুশিষ্যগণ সঙ্গে পরমানন্দে তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া অম্বিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্যামানন্দ নানাবিধ দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ ঠাকুরের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর শ্যামানন্দ রসিককে সঙ্গে লইয়া নৈহাটীর অর্জ্জুনীর গৃহে গমন করিলেন। তথায় শ্যামানন্দদেব বহুতর ব্যক্তিকে বৈষ্ণব মতে আনয়ন করিলেন। জগন্নাথ, দামোদর ও অর্জ্জুনীর পুত্র শ্যামদাস প্রভৃতি শত শত ব্যক্তি শ্যামানন্দের মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্যামানন্দ এইরূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে কাশীয়াড়ী হইয়া ঝাটীয়াড়া গ্রামে উপনীত হইলেন। তথায় হরিদাস নামক এক ব্যক্তিকে শিষ্য করিয়া অবশেষে মথুরা গ্রামে প্রবেশ করিলেন। মথুরার জমিদার ভীমধন তাঁহার অসামান্য গুণে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন এবং গোবিন্দপুর নামক একখানি গ্রাম শ্রীগুরুর সেবার জন্য দান করিলেন। আরও সেই গ্রামে শ্যামানন্দের বাসোপযোগী একখানি দিব্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। শ্যামানন্দ, শ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে বলরামপুর হইতে আনাইয়া নিরন্তর কৃষ্ণ-কথানন্দে তথায় পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে রসিকানন্দ শ্যামানন্দের আজ্ঞায় রাজগড়ের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ এবং রায় সেন ও রাউত্রা নামে আর তাঁহার দুই সহোদরকে কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। শ্যামানন্দের কৃপায় রসিক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তিনি সেই রাজসভায় আহূত শত শত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতকে শাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত করিলেন—অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-বলে তিনি সকল শাস্ত্রেই কৃষ্ণ-ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিলেন। পণ্ডিতগণের ঘট-পট-মায়া-ব্রহ্মাদির শুষ্ক বিচার-বিতণ্ডা,

রসিকের সরস প্রেমভক্তির প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন তাঁহারা শুষ্ক জ্ঞান-চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত মধুর প্রেম-ভক্তির ছায়া-শীতল-কুঞ্জের আশ্রয় লইয়া প্রাণে পরমা তৃপ্তি লাভ করিলেন। অনন্তর রসিক, রাজার নিকট বিদায় লইয়া, গোবিন্দপুরে শ্যামানন্দের নিকট উপনীত হইলেন। রসিক আসিবার কালে, শ্রীযমুনা ঠাকুরাণী নাম্নী এক সর্ব্বসুলক্ষণা ও সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বহু দ্রব্য উপহার সহ তাঁহাকে শ্যামানন্দের চরণে সমর্পণ করিলেন। শ্যামানন্দ রসিকের অনুরোধ খণ্ডন করিতে পারিলেন না। তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্রীযমুনা ঠাকুরাণীকে বিবাহ করিলেন। রসিকের চেষ্টায় সে বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল।

একদা শ্যামানন্দ রসিককে স্নেহ-মধুর বাক্যে কহিলেন,—"বৎস রসিক! তোমার ন্যায় শিষ্যলাভ করিয়া ধন্য হইলাম। তোমার করুণায় উৎকলবাসী রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেই দুর্ল্লভ ভক্তিধন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল। তোমারই সাহায্যে আমি অধম, প্রভুর আদেশ-পালনে সমর্থ হইলাম।"

রসিক ব্রীড়াবনত বদনে করযোড় করিয়া বলিলেন,—প্রভো! সে সকল আপনারই মহিমা। আপনি এ কাষ্ঠ-পুত্তলিকাকে যেমন নাচাইতেছেন, তেমনই নাচিতেছে। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কি আছে প্রভো!"

শ্যামানন্দ পরম প্রীত হইয়া বলিলেন,—"রসিক! নৃসিংহপুরের উদ্দণ্ডরায় মহাপাষণ্ড সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের হিংসা লইয়াই আছে। সে ব্যক্তি সাধু হইলে বড় ভাল হয়।"—

"নৃসিংহ পুরের ভূঞা উদ্দণ্ড সে রায়।
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হিংসা করেন সদায়॥
শত শত গুধড়ী সে লয় ছাড়াইয়া।
দ্রব্য লোভে বৈষ্ণবেরে মারে মত্ত হৈয়া॥
হেন জন সাধু যবে হয় ভাল হয়।
চল যাব তার ঠাঞি তোমায় আমায়॥ রঃ মঃ।"

এইরূপ কথা বার্ত্তা স্থির করিয়া শ্যামানন্দ ও রসিক নৃসিংহপুরে গমন করিলেন। তথায় শ্যামানন্দের এক অদ্ভুত প্রভাব লক্ষিত হইল। অতি দুরন্ত-প্রকৃতি উদ্দণ্ডরায় দর্শন মাত্র বিনা বাক্যব্যয়ে শ্যামানন্দের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। যে উদ্দণ্ডরায় বৈষ্ণব দেখিলে যষ্টি লইয়া ধাবিত হইতেন, সেই উদ্দণ্ড কি না দীনের অধীন ভাবে কাকুতি মিনতি করিয়া শ্যামানন্দের চরণে মস্তক লুটাইলেন। আহা! ইহা ভক্তের মহিমা—না ভগবানের অসীম করুণা!

এই ঘটনার পূর্ব্ব রাত্রিতে উদ্দণ্ডরায় এক অলৌকিক স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—প্রভু যেন প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে শ্যামানন্দের চরণাশ্রয় করিতে আজ্ঞা করিতেছেন, আর বলিতেছেন,—"যদি তাহা না করিস্ সবংশে তোর সর্ব্বনাশ করিব।"

এই হইতেই উদ্দণ্ডের দিব্য জ্ঞান লাভ হয়। তাই, তিনি শ্যামানন্দকে দর্শন করিয়াই ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় তাঁহার চরণে পতিত হইলেন; এবং সবংশে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। যিনি প্রবল প্রতাপ অসুর ছিলেন, শ্যামানন্দের কৃপায় মুহূর্ত্তে সে ব্যক্তি দেবোপম সাধু হইয়া উঠিলেন। এই দেখিয়া সকলেই মহা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং শ্যামানন্দের চরণপ্রান্তে বসিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিমল শিক্ষামৃত পান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উদ্দণ্ডরায় মহোৎসবের মহা আয়োজন করিলেন। ধারেন্দা হইতে শ্রীশ্যামরায় বিগ্রহকে আনাইলেন। মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল। তিন দিন ব্যাপিয়া দিবারাত্র বৈষ্ণব-সেবা চলিল। সহস্র সহস্র বৈষ্ণবের পদধূলিতে উদ্দণ্ডরায়ের গৃহ পবিত্র হইয়া গেল। উদ্দণ্ডরায় করযোড় করিয়া বলিলেন, "প্রভো! আমি মহাপাপী, দুরাচার; আমার ন্যায় নরকের কীট আর জগতে নাই। আমি শত শত সাধুর প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদের গুধড়ীতে (ছেঁড়া কাঁথা ও ঝোলা) ঘর বোঝাই করিয়া রাখিয়াছি। যদি আজ্ঞা করেন, আমি সে সকল এখানে আনয়ন করি।"

শ্যামানন্দদেব আদেশ করিলেন। উদ্দণ্ডরায় স্বয়ং সে সকল মাথায় করিয়া বহিয়া আনিলেন। পর্ব্বত প্রমাণ রাশিকৃত গুধড়ী, গণনা করিয়া দেখা গেল ৭১৮ খানি হইল! উদ্দণ্ডরায় এতগুলি সাধুর প্রাণ বিনাশ করিয়া নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাদের এই গুধড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। উঃ! কি ভয়ানক প্রকৃতির লোক! এ কথা ভাবিতে গেলেও যে প্রাণ কম্পিত হইয়া উঠে—হৃদয়ের রক্ত জল হইয়া যায়। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া বৈষ্ণবগণ একবারে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।—

"শুনি শ্যামানন্দ আজ্ঞা দিল আনিবারে।
গুধড়ী আনিয়া কৈল পর্ব্বত আকারে॥
সাত শত অষ্টাদশ হইল গণনে।
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে সর্ব্ব কাঙ্ক্ষ্য জনে॥" র: ম:।

শ্যামানন্দদেব সেই গুধড়ী গুলি এক এক খানি করিয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। উদ্দণ্ডরায় বহু বস্ত্র ও ধনরত্ন দিয়া

তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। বৈষ্ণবগণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে বিদায় হইয়া গেলেন।

কিছু দিন পরে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ উদণ্ডরায়ের নিকট বিদায় লইয়া কাশীয়াড়ীতে আসিলেন। তথায় শ্রীরাধাঠাকুরাণী প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্যামরায়ের সহিত শুভ পরিণয়-মহোৎসব মহা আড়ম্বরে সম্পন্ন করিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম, দামোদর, মথুরাদাস, হাড় ঘোষ এবং হরিদাস নামক এক ব্রাহ্মণও শ্যামানন্দের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ব্রজ-ললনাগণ যেমন জাতি, কুল, সমাজাদির অপেক্ষা না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া তুচ্ছ জাতি, কুল ও সমাজ-শাসনকে পায়ে ঠেলিয়া শ্যামানন্দের চরণে আত্ম-বিক্রয় করিতে লাগিলেন। কাহাকে শ্যামানন্দ আপনি মন্ত্র দিতেন, আবার রসিকচন্দ্রও কাহাকে মন্ত্র দিতেন, কাহাকে বা অন্যান্য যোগ্য শিষ্যগণও মন্ত্র দিতেন। এইরূপে বহুতর শিষ্য করিয়া শ্যামানন্দ ও রসিক কাশীয়াড়া হইতে শ্রীরাধাশ্যামরায় শ্রীযুগল বিগ্রহ লইয়া ধারেন্দায় উপনীত হইলেন। এই সময়ে ধারেন্দায় একদিন অসংখ্য শিষ্যগণ লইয়া এক মহা সঙ্কীর্ত্তনের দল বাহির করিলেন। সেই সঙ্কীর্ত্তনে শ্যামানন্দের উদ্দাম প্রেমোন্মত্তভাব দর্শন করিয়া বহু শত ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।—

"সঙ্কীর্ত্তনে নাচয়ে ঠাকুর শ্যামানন্দ।
সে ভঙ্গী দেখিতে দেবগণের আনন্দ॥
পাষণ্ড অসুরগণ সে নৃত্য দেখিয়া।
প্রেমায় বিহ্বল কান্দে ভূমে লোটাইয়া॥
'প্রভো, শ্যামানন্দ! উদ্ধারহ এইবার।'
ইহা বলি চরণে পড়য়ে বারবার॥

কৃপা দৃষ্টে শ্যামানন্দ চাহি সে সবারে।
ডুবাইলা প্রেম ভক্তি রসের পাথারে॥" ভঃ রঃ।

দয়াল শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপা-শক্তিতে শ্যামানন্দ ও রসিক এইরূপে প্রেম-ভক্তির সুধা-প্রবাহে সমগ্র উৎকল দেশকে প্লাবিত করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরাসোৎসব।

একদা শ্যামানন্দদেব রসিককে নিকটে ডাকিয়া স্নেহ-সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"বৎস! শ্রীকৃষ্ণের দোল মহোৎসব তো সম্পন্ন হইল, এক্ষণে গোপীবল্লভপুরে যাইয়া শ্রীরাসোৎসবের আয়োজন কর।"

রসিক আহ্লাদের সহিত তাহাতে সম্মতি জানাইলেন, এবং শীঘ্র শ্যামানন্দের স্থান হইতে বিদায় লইয়া গোপীবল্লভপুরে গমন করিলেন। শ্যামানন্দদেবও শিষ্যগণের প্রতি মহোৎসবের জন্য নানাবিধ দ্রব্য সংগ্রহের ভার দিয়া গোবিন্দপুরে উপনীত হইলেন, পরে তথা হইতে গোপীবল্লভপুরে গমন করিলেন। রসিক মহোৎসবের বিপুল আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। রসময় বংশীদাসাদি ধারেন্দার ভক্তবৃন্দও গোপীবল্লভপুরে গমন করিলেন। শত শত লোকের দ্বারা তোরণ, শ্রীরাস-মণ্ডপ কেলিকুঞ্জ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইল। শ্রীবৃন্দাবনের অনুরূপ লীলাস্থান ও লীলামূর্ত্তি সকল স্থানে স্থানে সংস্থাপন করা হইল। শ্রীবৃন্দাবনের সেই নয়ন-মনোলোভা সুষমারাশি যেন পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। যথাসময়ে অম্বিকা হইতে ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য বহুশিষ্য লইয়া

সেই বসন্ত রাসোৎসব দর্শন করিতে আগমন করিলেন। যাজিগ্রাম হইতে শ্রীনিবাস ও খেতরী হইতে নরোত্তমঠাকুর সপরিকরে আসিয়া মহোৎসবে যোগ দান করিলেন; শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পুত্র পৌত্রগণ বহুতর শিষ্যানুশিষ্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। ফলতঃ দ্বাদশ গোপাল ও চৌষট্টি মহান্তের যত শিষ্যপ্রশিষ্য আছেন সকলেই আগমন করিলেন।—

"দ্বারকা মথুরা বৃন্দাবন নীলাচল।
যে যে স্থানে যত ছিল কৃষ্ণ সহচর॥
রাসযাত্রা দেখিবারে আইল সবায়।
শত শত মহারাজা আইলা তথায়॥" রঃ মঃ।

রসিক যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বাসা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের পরিচর্য্যার জন্য বহুতর লোক নিযুক্ত করিলেন। পণ্ডিত, সাধু, সন্ন্যাসী যে কত আসিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, নারী লক্ষ লক্ষ লোকের সংঘট্টে গোপীবল্লভপুর সাগরকল্লোলের ন্যায় কল্লোলিত হইয়া উঠিল। এমনকি তিল ধারণের স্থানও রহিল না।—

"অপ্রমিত লোক শত মুখে কহা নয়।
সরিষা ফেলিলে ভূমে কভু না পড়য়॥" রঃ মঃ।

শত শত সঙ্কীর্ত্তনের দলে অহোরাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম ও লীলা কীর্ত্তন হইতে লাগিল। নানাবিধ বাদ্য ধ্বনিতে আকাশ পাতাল ধ্বনিত হইয়া উঠিল। নটনটীগণ শ্রীকৃষ্ণ লীলা নাট্যের অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দের প্রাণে প্রেমানন্দের রস-সঞ্চার করিতে লাগিল। যথাসময়ে শ্রীমন্দির হইতে শ্রীরাধাগোপীবল্লভজীউকে রাসমণ্ডপে লইয়া যাওয়া হইল। অমনি লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে শ্রীহরিধ্বনির সহিত সুমধুর বাদ্যধ্বনি

মিশিয়া দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিল। রসিক তন্ময়ভাবে নানা প্রয়োজনে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একটী গোক্ষুর সর্প তাঁহার পদে দংশন করিল। "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া রসিক আর সেদিকে ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করিলেন না। কৃষ্ণনামামৃত পানে সদ্যঃপ্রাণহর বিষের তীব্রজ্বালা মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। হইবারই তো কথা! কৃষ্ণনামামৃতপানে দুর্ব্বার ভবজ্বালাও যে আশু জুড়াইয়া যায়!

রসিক মহোৎসবানন্দে সে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে সে সর্পদংশনের কথা অবগত হইয়া সকলেই বিস্ময়-বিহ্বল হইলেন।

শুভ্র-জ্যোৎস্নাফুল্লা বাসন্তী পূর্ণিমায় শ্রীরাধাশ্যামের মধুর রাসোৎসব এবং বালকগণের ব্রজলীলা নাট্যের মনোহর অভিনয় সন্দর্শন করিয়া সকলে এমনই উৎফুল্ল হইয়াছেন, যে তাঁহারা তৎপরদিনেও ঐরূপ উৎসবের আয়োজন করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। রসিক তাঁহাদের আজ্ঞা অবহেলা করিতে না পারিয়া পুনরায় তৎপরদিনে উৎসবের আয়োজন করিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতে এমন ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, কেহ আর গৃহের বাহির হইতে পারিলেন না। ইহাতে সকলেই মহা দুঃখিত হইলেন। শ্যামানন্দপ্রভু তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন—

"তবে আজ্ঞা করিলেন শ্যামানন্দ রায়।
একরাত্রি প্রমাণ সে আর না যোয়ায়॥
সেই বাক্য সবাই করিল পরমাণ।
দধি কাদা আরম্ভিল তাহার বিহান॥" রঃ মঃ।

এইরূপে শ্রীরাসোৎসব মহা আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইল। রসিকের নামে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলেই শত মুখে সে মহোৎসবের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এমন রাসোৎসব কেহ কখন

দেখে নাই, শুনেও নাই। বাস্তবিকই রসিকানন্দের রাসোৎসব এক অবর্ণনীয় মহা বিরাট্ ব্যাপার !!

মহোৎসবান্তে মাল্য, চন্দন, বসন, ভূষণ অর্থাদি দ্বারা সাধু, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, রাজা, প্রজা সকলেরই মর্য্যাদা রক্ষা করা হইল। সকলেই রসিকের যশোগানে দিগন্ত মুখরিত করিতে করিতে বিদায় হইয়া গেলেন। তাহার পর রসময়ের পুত্র গোপীবল্লভ, দেবকীদাস, গৌর, রঘুনাথ প্রভৃতি যে আটজন বালক অষ্টসখী সাজিয়া শ্রীবৃন্দাবন লীলার অভিনয় করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিচিত্র বসনাভরণে বিশেষরূপে পরিতুষ্ট করা হইল।

শ্যামানন্দদেব গোপীবল্লভপুরে রসিকের দ্বারা এইরূপ ঐশ্বর্য্যময় রাসোৎসব প্রকাশ করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করিলেন. এই সময়ে একদিন রঘুনাথ পট্টনায়কের এক ভ্রাতা আসিয়া শ্যামানন্দ দেবের চরণে নিবেদন করিলেন যে, রাধানগরে পাঠানদস্যুগণ ভয়ানক উপদ্রব করিতেছে। তাঁহাকে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এই কথা শুনিয়া শ্যামানন্দ রসিককে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে ধারেন্দায় আগমন করিলেন এবং রঘুনাথের মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দশ বিশজন বৈষ্ণবকে সঙ্গে লইয়া রসিকানন্দকে বাণপুরে সুবাদারের নিকট যাইতে অনুমতি করিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ আহম্মদী বেগ তখন উড়িষ্যার সুবাদার। রসিক, বংশীদাসাদি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া বাণপুরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বহু লোককে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ভক্তি-ধর্ম্মের অমৃত-শীতল ছায়াপথ দেখাইয়া দিলেন। পূর্ব্ব হইতে রসিক ও বংশীর প্রতি শ্যামানন্দদেবের আশীর্ব্বাদ আছে যে, তোমরা যাহাকে স্পর্শ করিবে তাহারই কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে।

"পূর্ব্বে শ্যামানন্দের আজ্ঞা এ দোঁহার প্রতি।
যারে পরশিবে তার হবে কৃষ্ণ-ভক্তি॥
সেই আজ্ঞায় এ দোহার দরশ পরশে।
কোটি কোটি শিষ্য হৈলা বনভূমি দেশে॥" রঃ মঃ

অনন্তর রসিক ও বংশী বাণপুরের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জের ভবনে উপনীত হইলেন। রাজা যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। রসিকের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া নিত্য বহুশত ভক্ত-সম্মিলন হইতে লাগিল এবং শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের তুমুল রোলে দিগ্ দিগন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। ক্রমে রসিকানন্দের মহিমার কথা আহম্মদী বেগের কর্ণে পঁহুছিল। তিনি শুনিলেন রসিকানন্দ একজন "মস্ত বড় বুজরুগ বৈষ্ণব।" উড়িষ্যার হিন্দু মাত্রেই প্রায় তাঁহার শিষ্য। এমন কি শতশত মুসলমানও তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া হিন্দুর হরিনামে মজিয়াছে!

"আহম্মদী বেগ ক্রোধে অনলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। বলিলেন হিন্দুকে শিষ্য করুক, তাহার দোষ নাই; কিন্তু মুসলমানকে শিষ্য করিবার তাহার অধিকার কি?"

এই বলিয়া রসিকানন্দকে আনিবার জন্য তখনই বাণপুরে দূত পাঠাইয়া দিলেন। আহম্মদী বেগের প্রতাপে তখন উড়িষ্যার রাজা প্রজা সকলেই থরহরি কম্পমান। তাঁহারা এই আদেশ শুনিয়া মহা-চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে একটা প্রকাণ্ডকায় বন্যহস্তী বাণপুরে আসিয়া ভয়ানক উৎপাত করিতেছিল, সুবাদার বলিলেন, যদি এই হাতীটাকে হরিনাম দিয়া বশ করিতে পারে, তবে বুঝিব সাধুর 'কেরামতি' আছে। নতুবা তাহার উচিত দণ্ড দিব।"

কি জানি কি ঘটে! না জানি রসিকের আজ কি অমঙ্গল হয়, এই রূপ উৎকণ্ঠায় সকলেরই মন ব্যাকুল হইল। রসিক স্মিত-প্রফুল্লমুখে

সকলকে সান্ত্বনা করিয়া জগতী গ্রামের দিকে চলিলেন। জগতীতেই তখন আহম্মদী বেগ অবস্থান করিতেছিলেন। দৈবক্রমে রসিক পথি-মধ্যে সেই দুরন্ত হস্তীর সম্মুখে পতিত হইলেন। রসিকের দর্শনে হস্তীর সেই উদ্ধত প্রকৃতি, সেই পশুভাব মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইল। সেই বনের পশু যেন ভক্তিতে বিবশ হইয়া রসিকের পদে প্রণত হইল। রসিক তাহার কর্ণে হরিনাম মন্ত্র প্রদান করিয়া "শ্রীগোপাল দাস" বলিয়া তাহার নাম রক্ষা করিলেন। যিনি শ্রীশিবানন্দ সেনের কুক্কুরকে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদাইয়া ছিলেন, যিনি ঝারিখণ্ডের পথে ব্যাঘ্র কুরঙ্গাদিকে একত্র কৃষ্ণ নামে নাচাইয়া ছিলেন, এ মহিমা-প্রকাশও সেই প্রেম-পয়োধি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেরণা ভিন্ন আর কিছুই নয়! হস্তী বিবশাঙ্গে লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করিল। এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়-পাথারে নিমগ্ন হইলেন। আহম্মদী বেগও নিজ কৃতাপরাধের জন্য রসিকের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন।

রসিকের গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া পঞ্চটীর অধিপতি রাজা হরি-নারায়ণ, পটাসপুরের রাজা নৃসিংহ গজপতি প্রভৃতি অনেক রাজা ও ভূম্যাধিকারী রসিকানন্দের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবন-বিনোদ বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ যে কলপদায়ত বংশীপানামৃতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিপ্রীণিত করেন, রসিকানন্দ নৃসিংহ গজপতিকে সেই মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করাইয়া কৃতার্থ করিলেন। এইরূপে রসিক প্রেমভক্তির মন্দাকিনী প্রবাহে বাণপুরকে প্লাবিত করিয়া নীলাচল-তিলক শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখশশী দর্শনের অভিলাষে পুরুষোত্তম ধামে উপনীত হইলেন। তথায় অবস্থান কালে স্বপ্নাবেশে শ্রীদারুব্রহ্ম, রসিককে গোপীবল্লভপুরে ললিত ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দজীউ বিগ্রহ প্রকাশ করিতে আদেশ

করিলেন। রসিক সঙ্গের ভক্তগণকে সে আনন্দ-কাহিনী জ্ঞাপন করিলে তাঁহাদের হৃদয়, আনন্দের অশ্রু-প্রবাহে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। এই সময় রঘুনাথ ও আনন্দ নামক দুইজন ভাস্কর আসিয়া রসিকের সহিত মিলিত হইল।—

"নীলাচলবাসী তারা দুই সহোদর।
বিশ্বকর্ম্মা রূপ শিল্প শাস্ত্রেতে তৎপর॥
দেখিয়া আনন্দ হৈলা অচ্যুত নন্দন।
দুই ভাই সঙ্গে লইয়া করিলা গমন॥"রঃ মঃ।

শ্যামানন্দ তখন ধুরিয়া গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। রসিক স্বগণ সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়া শ্রীগুরুর পাদপদ্মে সমস্ত নিবেদন করিলেন। শ্যামানন্দের ইচ্ছায়, সেই ভাস্করদ্বয় দ্বারা এক শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মিত হইয়া "শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র" নামে ধুরিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনন্তর রসিক সেই ভাস্করদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া গোপীবল্লভপুরে গমন করিলেন এবং মহামহোৎসবের সহিত শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন।

শ্যামানন্দ দেব ধুরিয়া গ্রামে থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবার্চ্চনা করিতে লাগিলেনন এবং ভক্তি-কল্পতরুর মালী হইয়া দিবারাত্র যাচিয়া যাচিয়া আচণ্ডালে প্রেমফল বিলাইতে লাগিলেন! শতশত সাধু সজ্জনের সমাগমে নিত্যই তথায় মহোৎসব হইতে লাগিল। শ্যামানন্দ এই সাধু সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ উদ্দেশ্যে সাহায্য ভিক্ষার নিমিত্ত রসিককে ঘণ্টশিলায় (বর্ত্তমান ঘাটশিলা) রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা সাধু সেবার প্রসঙ্গ শুনিয়া আনন্দের সহিত সাতটী নামে গ্রাম খানি দান করিলেন। শ্যামানন্দদেব সেই গ্রামের নাম শ্যামসুন্দরপুর রাখিলেন। শ্যামানন্দ সেই গ্রামে এক বাড়ী তৈয়ার করাইয়া

কিছুদিন বাস করিলেন। পরে অযোধ্যা নামক গ্রামেও এক বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করাইলেন। তাহার পর ছোট গোবিন্দপুরেও কিছুদিন অবস্থান করিলেন। শ্যামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গ দাসী এই তিন ঠাকুরাণীকেও তথায় আনয়ন করিলেন। এইরূপে শ্যামানন্দদেব কৃষ্ণ প্রেমরঙ্গে ও সাধুসেবায় পরমানন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ইহার পর শ্যামানন্দ প্রভু রসিকের মহিমায় অতিমাত্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঠাকুর গোসাঞি অর্থাৎ "দেবগোস্বামী" উপাধি প্রদান করিলেন। তদবধি রসিক সকলের নিকট "ঠাকুর গোসাঞি" নামে সম্বোধিত হইতে লাগিলেন। অদ্যাবধি রসিকের বংশধরগণও "দেব-গোস্বামী" উপাধি-ভূষিত। শ্যামানন্দ প্রভু কখন ধারেন্দায় কখন শ্যাম সুন্দরপুরে রসিকাদি ভক্তগণ সঙ্গে দিবারাত্র কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর। তিনি কখন উচ্চরবে কখন বা করুণার পরিক্ষীণ স্বরে "হা গৌরাঙ্গ, হা গোবিন্দ" বলিয়া রোদন করেন—নয়ন-নিঃসৃত অশ্রুমালার অজস্র প্রবাহে হৃদয়ক্ষেত্র ভাসিয়া যায়—কখন হাস্য করেন, কখন বা উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে থাকেন। এইরূপে ক্রমেই মহাপ্রেমের লক্ষণনিচয় তাঁহাতে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বহিরঙ্গ লোক তাঁহার প্রবল বায়ু বিকার উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। এমন কি, এজন্য বৈদ্যগণের উপদেশে বলরামপুরের রাজা হরিচন্দনের গৃহ হইতে উৎকৃষ্ট হিমসাগর তৈল আনিয়াও তাঁহাকে মাখান হইল। কিন্তু তাহাতে সে কৃষ্ণ-বিরহোন্মাদের কোনই প্রতিকার হইল না। কিছু দিন পরে শ্যামানন্দদেব প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হইলেন। শ্রীসঙ্কীর্ত্তন প্রবাহে আবার নূতন জোয়ার উঠিল—ভক্তগণের

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মহা-নির্য্যাণ।

কালচক্রের কুটীল আবর্ত্তনে শ্যামানন্দদেবের লীলাবসানের কাল সমাগত হইল। তিনি ক্রমশঃ জরাগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। এদিকে শ্রীপাট অম্বিকায় ঠাকুর হৃদয়চৈতন্য ইহধাম ত্যাগ করিয়া শ্রীগোলোক ধামে প্রস্থান করিলেন। শ্যামানন্দ প্রভু সে শোক-সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র ভূলুণ্ঠিত হইয়া বহু রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া বিলাপের করুণ ধ্বনিতে পাষাণ প্রাণেও অশ্রু ঝরাইলেন। রসিককে আনিবার জন্য সেই দিনই লোক চলিয়া গেল। যথাসময়ে রসিক আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্যামসুন্দরপুরে ঠাকুরের আরাধনা-মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

মহোৎসবের পর শ্যামানন্দ গোবিন্দপুরে গমন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে দামোদরও অপ্রকট হইলেন। দামোদরের বিরহে শ্যামানন্দ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দপুরে তাঁহারও আরাধনা মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

অতঃপর একদিন রসিককে নিকটে বসাইয়া স্নেহ-মধুর বাক্যে বলিলেন—"বৎস! প্রভুর আজ্ঞায় তোমার সাহায্যে এতকাল উৎকলে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করিলাম। এখন উৎকলবাসী সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে ও কৃষ্ণনামে মহামাতোয়ারা! তুমি ইহাদিগকে লইয়া কিছুকাল সংসারে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিচরণ কর। আমার দেহ নিতান্ত জরা-জীর্ণ ও অপটু হইয়াছে। আমি সংসারে আর ক্ষণমাত্র থাকিতে ইচ্ছা করি না। আমার অন্তিমকাল সমাগতপ্রায়।"

রসিক এই কথা শুনিয়া এককালে শতবজ্রাহতের ন্যায় ব্যথিত হইলেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারময় দেখিলেন। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। শ্রীগুরুদেবের চরণে মস্তক রাখিয়া অঝোর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্যামানন্দ স্নেহভরে স্বীয় উত্তরীয় বসনে রসিকের বদন মুছাইয়া বলিলেন—"বৎস! কাঁদ কেন? সংসারে জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু অবশ্য-ম্ভাবী; সুতরাং ইহার জন্য শোক করা বৃথা। বৎস! আমি অগ্রে চলিলাম, তুমিও কিছুদিন সংসারে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া পশ্চাৎ আইস। আবার মিলন হইবে,—সে মিলনে আর বিচ্ছেদ ঘটিবে না।"

অতঃপর শ্যামানন্দপ্রভু রসিককে সঙ্গে লইয়া নৃসিংহপুরে আগমন করিলেন। আসিয়াই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় উদ্দণ্ড-রায়ের বাড়ীতেই সপরিবার অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিমাস গত হইয়া গেল। কত বৈদ্য আসিলেন, কত রকম ঔষধের ব্যবস্থা হইল; কিন্তু পীড়া ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রসিকানন্দ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রাত্র দিন তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

১৫৫২ শকাব্দা, আষাঢ়ী পূর্ণিমার স্নানযাত্রার পর কৃষ্ণপ্রতিপদ্ তিথি। শ্যামানন্দপ্রভু অন্তিমশয্যায় শয়ন করিয়া সমস্ত শিষ্যসেবককে সমবেত হইতে বলিলেন। আজ্ঞামাত্র সকলেই প্রভুকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। শ্যামানন্দ সকলকে স্নেহ-সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন—"তোমারা আমার জন্য বৃথা যত্ন করিতেছ কেন? কৃষ্ণের আজ্ঞা—আমাকে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে। তোমরা সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ কর; নিরন্তর কৃষ্ণকথার আলোচনা কর। এ সময়কার ইহাই পরম ঔষধ।"

এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ভক্তগণ বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

রসিক কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল ভাবে বলিলেন—"প্রভো! আমাকেই অগ্রে যাইতে আদেশ করুন! আমি আপনার বিচ্ছেদে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব?"

শ্যামানন্দ রসিকের বদন চুম্বন করিয়া বলিলেন "বৎস!

উৎকলে জন্মিলা যত শ্যামানন্দীগণ।
তারে লইয়া কতদিন কর বিহরণ॥
আমার আজ্ঞায় থাক উৎকল ভুবনে।
মনেতে জানিহ সদা আছ বৃন্দাবনে॥
কতদিন কৃষ্ণভক্তি করহ প্রচার।
কৃষ্ণ প্রেমে টলাটলী করহ সংসার॥
ঘরে ঘরে সাধু সেবা করহ যতনে।
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি দেহ সর্ব্বজনে জনে॥
শ্রুতি স্মৃতি ভাগবত শাস্ত্র পরমাণ।
গুরু কৃষ্ণ সাধু সেবা আর দ্বিজগণ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম পালন করহ ভূমণ্ডলে॥" রঃ মঃ।

এই বলিয়া শ্যামানন্দ রসিকের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শত শত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় শিষ্য থাকা সত্ত্বেও শ্যামানন্দ, রসিকানন্দকেই সর্ব্বৈব সুযোগ্য বোধে শ্রীপাটের মহান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বিরাট্ শ্যামানন্দী-সম্প্রদায়ের মস্তকমণি স্বরূপে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পণ করিলেন। রসিকের মস্তকে স্বহস্তে স্বীয় উত্তরীয় বসন বান্ধিয়া দিয়া ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিলেন। অনন্তর করযোড় করিয়া সকলের প্রতি কহিলেন—

"রসিকের আজ্ঞাতে থাকিবে সর্ব্বজন।
সবাকারে রসিকেন্দ্র করিবে পালন॥

রসিকের আজ্ঞা কেহ না করিবে ভঙ্গ।
রসিক বিমুখ যে, সে নহে আমা সঙ্গ॥" রঃ মঃ।

এইরূপে শক্তিসঞ্চার করিয়া রসিকানন্দকে সকল অধিকারই প্রদান করিলেন। তখন ভক্তগণ উচ্চকণ্ঠে হরিধ্বনি করিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে মঙ্গল-মধুর ধ্বনিতে আকাশ-অবনী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সে ধ্বনি বুঝি বা শ্রীগোলকের অন্তঃপুর মধ্যেও প্রবেশ করিল। শ্যামানন্দ প্রভু রসিকানন্দের কোলে মস্তক রাখিয়া "হা গৌরাঙ্গ! হা গোপীজন-বল্লভ!" বলিতে বলিতে স্থূল নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া "শ্রীকনক মঞ্জরী" নাম্নী নিত্যসিদ্ধ মঞ্জরী দেহে নিত্যধামে শ্রীরাধা-শ্যামের প্রেমের রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

"পনেরশ বায়ান্ন শকাব্দা সে প্রমাণ।
কৃষ্ণের সন্নিধে প্রভু করিলা প্রয়াণ॥
দেব স্নানযাত্রা পূর্ণিমার শেষে।
কৃষ্ণপ্রতিপদ্ তিথি আষাঢ় প্রবেশে॥
হরিধ্বনি শঙ্খধ্বনি সঙ্কীর্ত্তন ধ্বনি।
গগনমণ্ডলে প্রবেশিলা জয় বাণী॥
হেনই সময়ে প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান্।
শুনিয়া মণ্ডলী সবার হরিলা জ্ঞেয়ান॥" রঃ মঃ।

যাও শ্যামানন্দ! সেই প্রেমময়ের, চির মধুময় প্রেমের রাজ্যে যাও! যেখানে শোক নাই, তাপ নাই, দুঃখ নাই, কাম-কৈতবের তাণ্ডবলীলা নাই, অঘটন-পটীয়সী মায়ার মোহিনীশক্তির বিকাশ নাই! যেখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উদ্দাম তরঙ্গ, আনন্দেরই লীলা খেলা! যেখানে নিত্যই প্রাণারাম প্রেমগীতিকার মধুর ঝঙ্কার, যাও শ্যামানন্দ! সেই আনন্দময়ের আনন্দধামে গমন কর। যেখানকার ভূমি চিন্তামণি,

উদ্যান কল্পতরুময়, সলিল সুধা-ধারা, বাণী বীণাধ্বনি, যথায় চির বসন্ত বিরাজিত, চির মলয় প্রবাহিত, চির কুসুম বিকসিত। যাও শ্যামানন্দ! প্রেমকুঞ্জের কলকণ্ঠ পিক! যাও তোমার চির আকাঙ্ক্ষিত কুঞ্জে উড়িয়া যাও, সেখানে তোমার মধুমাখা সাধুকণ্ঠে শ্রীরাধাশ্যামের গুণগাথা প্রাণ ভরিয়া গাওগে! যেখানে শ্রীরূপসনাতনাদি অবস্থান করিতেছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রঘুনাথ দাসাদি যে ধামে গমন করিয়াছেন, যাও শ্যামানন্দ! সেই নিত্যধামে সেই নিত্য প্রেমলীলারসময় শ্রীবৃন্দাবনে গমন কর! তোমার প্রাণাধিক প্রিয়-সুহৃদ শ্রীনিবাস ও নরোত্তম তথায় আকুল প্রাণে তোমার অপেক্ষা করিতেছেন!

শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের তিরোধানের পর নরোত্তমঠাকুর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। আবার ঠাকুর মহাশয়ের তিরোধানের পরেই শ্যামানন্দ প্রভুর এই মহানির্ব্বাণ ঘটে। শ্যামানন্দের বিরহে সকলে যার-পর-নাই শোকার্ত্ত হইলেন। রসিক ধূলায় পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। শ্যামানন্দ প্রভুর প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া যদিও শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃত বিলাস-কুঞ্জে উড়িয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কেমন দেবভাব! তাঁহার অনবদ্যাঙ্গে তখনও কেমন স্বর্গীয় জ্যোতি! সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া ভক্তগণ মহা বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার দেহ যথারীতি মহাসমারোহে সমাহিত করা হইল। তাঁহার এই সমাধি মন্দির বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ মহারাজের রাজ্যের মধ্যে পরগণা সমাদ্দার অন্তর্গত কানপুর গ্রামে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। রসিকানন্দ শ্যামানন্দী অসংখ্য শিষ্য ও ভক্তগণ লইয়া শ্যামানন্দ প্রভুর আরাধনা মহোৎসব সম্পাদন করিলেন। পূর্ব্বে যেরূপ শ্রীরাসমহোৎসব হইয়াছিল, এ মহোৎসব তদপেক্ষাও বৃহৎ ব্যাপার হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

রসিকানন্দের শেষ কাহিনী।

রসিকানন্দ, শ্যামানন্দের প্রাণ স্বরূপ। রসিকের জীবনের সহিত শ্যামানন্দের জীবন যেন ওতঃপ্রোতভাবে গ্রথিত। শ্যামানন্দের কৃপাশক্তি লাভ করিয়া রসিক ভক্তগণ সঙ্গে শেষজীবন অপূর্ব্ব রঙ্গে যাপন করিলেন। তাঁহার সে সকল অলৌকিক কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া যায়। ভক্তপাঠক-বর্গের অবগতির জন্য প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

শ্যামানন্দের বিরহে অতিমাত্র কাতর হইয়া কিশোর ও চিন্তামণি কিছুদিন পরে নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন। রসিকানন্দ কালীয়াড়ীতে যাইয়া তাঁহাদের যথোচিত শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। যথা সময়ে রসিক

---

* দ্বাদশ মহোৎসব যথা।—(১) স্নান পূর্ণিমান্তে কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব মহোৎসব। (২) হোরা পঞ্চমীতে মহোৎসব। (৩) শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে মহোৎসব। ৪। শ্রীগৌর জন্মোৎসব (৫) শ্রাবণী শুক্লাত্রয়োদশীতে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসব (৬) ভাদ্রমাসে শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব (৭) শ্রীরাধা-জন্মোৎসব (৮) কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন মহোৎসব (৯) উত্থান একাদশীতে মহোৎসব (১০) এই একাদশীর পর পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীরাসোৎসব (১১) দোল পূর্ণিমায় মহোৎসব (১২) এই শুক্লা দ্বাদশী দিনে শ্রীহৃদয়ানন্দ ঠাকুরের দিন-মহোৎসব।

তাঁহাদের মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া ধারেন্দায় দামোদর গোস্বামীর দিন-মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর গোপীবল্লভপুরে দ্বাদশ *মহোৎসবের দিন বিধিবদ্ধ করিয়া নিরন্তর ভক্তিধর্ম্ম-প্রচার ও বৈষ্ণব-সেবা-ব্রতে সংলিপ্ত থাকিলেন। সেই সকল মহোৎসবে গৌড়, ব্রজ, নীলাচল হইতে বহুসংখ্য ভগবদ্ভক্ত আসিয়া সম্মিলিত হইতেন। রসিক তাঁহাদের সহিত ভক্তির বিশুদ্ধসঙ্গীত গাহিয়া জীবন কৃতার্থ মনে করিতেন। শ্যামানন্দের আজ্ঞাক্রমে রসিক শ্যামানন্দের পত্নীত্রয়কে শ্যামসুন্দরপুরে আনয়ন করিয়া একত্র শান্তভাবে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। শ্যামানন্দ প্রভু চরম সময়ে ঠাকুরাণীত্রয়কে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র ও শ্রীব্রজ-মোহন এই শ্রীবিগ্রহযুগলের সেবা করিয়া শেষজীবন অতিবাহিত করিবার আজ্ঞা করেন। তজ্জন্য রসিক উদ্দণ্ডরায়ের গৃহ হইতে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রকে আনয়ন করিয়া শ্যামসুন্দরপুরে স্থাপিত করিলেন। এই সময়ে রসিক হিজলী, ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভক্তি-মন্দাকিনী ধারায় বহুশত ব্যক্তির মানস-মরু শান্তির ছায়াশীতল কুঞ্জে পরিণত করিলেন। এদিকে বংশীদাসও বনভূমি প্রদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে রসিকের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। রসিক ও বংশী যখন হিজলীতে গমন করেন, সেই সময়ে এক উদ্ধত-স্বভাব ব্রাহ্মণের সহিত রসিকের ঘোর বাক্-বিতণ্ডা হয়। ব্রাহ্মণ শ্যামানন্দ প্রভুর বহুতর নিন্দাবাদ করেন। রসিক গুরুনিন্দা এবং বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। পরে সেই ব্রাহ্মণপ্রমুখ বিদ্বেষিগণকে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিলেন যে,—"তোমরা এ দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় যখন জন্ম গ্রহণ করিবে, তখন তোমাদিগকে কোলে করিয়া হরিনাম দিব।" পত্র পাঠ করিয়া সেই দুষ্ট-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ, সেই পত্র কুক্কুরের গলায় বান্ধিয়া দিবার কথা বলিয়া

যেমন বহিরঙ্গণে পদার্পণ করিলেন, অমনই একটী উন্মত্ত কুক্কুর আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অল্পদিন মধ্যেই ব্রাহ্মণ, কুকুরের ধ্বনি করিতে করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। বৈষ্ণবনিন্দক ব্রাহ্মণের এই শোচনীয় অবস্থা আলোচনা করিয়া সেই প্রদেশের সমস্ত লোকই মহা চমৎকৃত হইল। যিনি কাঙ্গাল-ভূপাল, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেরই গুরুস্থানীয় ও বরেণ্য, তাদৃশ মহাজনের অসম্মান করা যে নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য—অমার্জ্জনীয় অপরাধের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ কি? শাস্ত্র, তাদৃশ অপরাধীর জিহ্বা ছেদনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যথা—

"ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতী মসতাং প্রভুশ্চেৎ।
জিহ্বা মসূন পিততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ॥ শ্রীভাঃ

এদিকে শ্যামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গ দাসী এই তিন ঠাকুরাণীতে নিত্যই পরস্পর কলহ হইতে লাগিল। রসিক, সে সংবাদ শুনিয়া শ্যামসুন্দরপুরে আসিয়া ঠাকুরাণীত্রয়কে বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিলেন; তখন শ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণী বলিলেন—"বাপু! তুমি আমাদের পুত্র স্বরূপ; ঠাকুর তোমার উপরেই আমাদের দেখা-শুনার সকল ভার দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেখ বাপু! আমাদের একত্র কখনই দিন যাইবে না। তুমি এই গ্রামে তিন জনের জন্য তিন খানি বাড়ী তৈয়ার করিয়া দাও।"

রসিক সে কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। শ্যামানন্দ প্রভু তিন ঠাকুরাণীকে একত্র থাকিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন; সে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্রাচরণ করিলে শ্যামানন্দী কোন বৈষ্ণবই আর তথায় আসিবেন না। এই কথা দৃঢ়ভাবে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলে, বড় ঠাকুরাণী মনে মনে মহাবিরক্ত হইলেন। কেশবানন্দ, হরিকর, বিষ্ণুরাম, কালিন্দী, রাধাজীবন প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ

করিয়া রসিককে অপদস্থ করিবার এক উপায় স্থির করিলেন। কনিষ্ঠা ঠাকুরাণীকে বিষ-প্রয়োগে বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে রসিক যেন শ্যামপ্রিয়া ঠাকুরাণীকে অনুরোধ করিয়াছেন এই মর্ম্মে এক খানি কৃত্রিম পত্র লিখিত হইল এবং সভা করিয়া রসিককে আনাইয়া সকলের সমক্ষে সেই পত্র পঠিত হইবে, ইহাই স্থির হইল।

পরামর্শানুযায়ী কার্য্যারম্ভ হইল। মহোৎসবান্তে ভক্তগণ সভা করিয়া বসিলেন। বড় ঠাকুরাণী রসিককে তীব্রবাক্যে তিরস্কার করিয়া সেই পত্রখানি বাহির করিলেন। পদ্মলাভ ও গোপীদাস সর্ব্বজন-সমক্ষে পত্র খানি পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পত্রে পূর্ব্বের লেখা কিছুই নাই। তৎপরিবর্ত্তে শ্রীভাগবত ও শ্রীগীতগোবিন্দাদি গ্রন্থের উৎকৃষ্ট শ্লোকাবলীতে পত্র খানি পরিপূর্ণ। প্রতারণার কুহেলিকা-জাল ছিন্ন হইয়া গেল দেখিয়া, বড় ঠাকুরাণী মহা লজ্জিতা ও শঙ্কিতা হইলেন। যাহারা এই কুৎসিত-ব্যাপারে সংলিপ্ত ছিল, তাহারাও ক্রমে সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িল। বড় ঠাকুরাণী আপনাকে শত শত ধিক্কার দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন রসিক সমস্ত ভক্তগণের সহিত বিচার করিয়া এই আদেশ করিলেন যে,—

"উপদ্রব হৈল এই স্থানে অনুক্ষণে।
এখানে রহিতে আর নাহি লয় মনে॥
শ্রীগোপীবল্লভপুরে মহোৎসব হৈবে।
শ্যামানন্দী গোষ্ঠী আর হেথা না আসিবে॥রঃ মঃ।

এই কঠোরাজ্ঞা প্রচার করিয়া রসিক গোপীবল্লভপুরে মহোৎসব করিলেন। সমাগত বৈষ্ণবগণ প্রসাদ ভোজনে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময়ে মহাঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। রসিক বৈষ্ণবসেবার বিঘ্ন দর্শন করিয়া, রুদ্রদেবের নিকট, সেই স্থান ব্যতীত অন্যত্র বৃষ্টি হইবার

প্রার্থনা করিলেন। বস্তুতঃ সে স্থানে আদৌ ঝড় বৃষ্টি হইল না। বৈষ্ণব-সেবা নিরাপদে নিষ্পন্ন হইয়া গেল।

এই ঘটনার পর রসিকানন্দ শ্রীজগন্নাথ-দেবের স্বপ্নাদেশ পাইয়া বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে শ্রীনীলাচল যাত্রা করিলেন। ভক্তির বিজয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহারা যে পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, সেই পথের উভয় পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রেম-ভক্তির অমল আলোকে সমুদ্ভাসিত হইতে লাগিল। এইরূপে তিনি মুক্তাপুরে উপস্থিত হইলেন। বহু অনুনয় সত্বেও গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে লোকালয়ে স্থান দিল না। অগত্যা রসিক সকলকে বৃক্ষতলে থাকিতে আদেশ করিলেন। এদিকে গ্রামে অগ্নি সংলগ্ন হইয়া শত শত গৃহ ভস্মীভূত হইতে লাগিল। গ্রামবাসীরা ভয়ে আকুল হইয়া রসিকের চরণে শরণ লইল। তাঁহার কৃপা ঈক্ষণে সেই লহলহ জিহ্ব দিগ্দাহী অনল মুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। রসিকের এই অলৌকিক প্রভাব অবলোকন করিয়া গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার সেবক হইল। চারি দিক হইতে শত সহস্র লোক হরিধ্বনি করিয়া রসিককে দেখিতে আসিতে লাগিল। তিনি স্বগণ সহ তথা হইতে বালেশ্বর রামনগরে প্রবেশ করিলেন। পরে সে স্থান হইতে যাজপুরে উপনীত হইলেন। তথায় বৈতরণী নদীতে স্নান করিয়া অশ্বমেধ ঘাটে শ্রীবরাহনাথ দর্শন করিলেন। এই সময়ে সহসা ভয়ানক বন্যা উপস্থিত হইল। রসিক স্বগণ সহ নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী পার হইবার কালে ভীষণ তরঙ্গাবর্ত্তে নৌকা খানি মধ্যভাগে নিমগ্ন হইয়া গেল। সমুদ্র তুল্য গভীর নদী; কিন্তু রসিকের মহিমাগুণে সে নদীর মধ্যভাগে সকলের হাঁটু প্রমাণ জল হইল। কাহারও জীবনের হানি হইল না, এমন কি কাহারও কোন দ্রব্যও নষ্ট হইল না। তাঁহারা পুনরায় নৌকায় আরোহণ করিলেন। পরে সকলে দেখিলেন—

যেখানে রসিক ও তাঁহার সঙ্গিগণ দাঁড়াইয়াছিলেন সেখানে বিশ হাত এক খানি বংশদণ্ড নিক্ষেপ করিলেও স্থল স্পর্শ করে না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এই সময়ে দেখিলেন—সঙ্গে যে শ্রীমদ্ভাগবত খানি ছিল, তাহা দূরে খর-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে অনেক ব্যক্তি নৌকা লইয়া পুঁথি খানি ধরিতে গেল, কিন্তু শত শত ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও তাহা জল হইতে নৌকায় তুলিতে পারিল না। তখন রসিক যাইয়া অনায়াসে সেই গ্রন্থ নৌকায় তুলিলেন। অমনই উভয় কূল হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে হরিধ্বনি উত্থিত হইল।

এদিকে রথযাত্রার সময় উপস্থিত। শ্রীভদ্রা সহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রথারোহণ করিয়াছেন। রসিকানন্দ তখনও শ্রীনীলাচলে পঁহুছিতে পারিলেন না। রসিক আকুল প্রাণে শ্রীনীলাচলচন্দ্রের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন—"প্রভো! রথোপরে আপনার মেঘশ্যাম শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে পাইব নাকি?"—ভক্তের কাতরতা দর্শনে ভক্তবৎসল হরি ভক্তের ভাব-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। রথ আর চলে না, অসংখ্য কলা পিঠিয়া রথ-রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল, রথ একপদও অগ্রসর হইল না। হস্তী-অশ্ব সংযোজিত করিয়া আকর্ষণের চেষ্টা করা হইল, তাহাও ব্যর্থ হইয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া রাজা পর্য্যন্ত সকলেই মহাচিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে আকাশবাণীতে রাজা শুনিলেন—

"মোর প্রিয় নিজভক্ত রসিক আইলা।
তুলসী চৌরাতে আসি পরবেশ কৈলা॥
রসিক আসিয়া রথ করিবে দর্শন।
তবে সে চলিবে রথ না কর যতন॥" রঃ মঃ।

সেই দণ্ডে রাজা গজপতি স্বয়ং অগ্রবর্ত্তী হইয়া রসিককে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। রসিকের স্পর্শমাত্র রথ পবনবেগে গুণ্ডিচায় আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। তখন ভক্ত ও ভগবানের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। অনন্তর রসিক রাজার নিকট কিছু ভূমি যাচ্ঞা করিয়া লইয়া শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে "ফুলতোটা" নামে এক মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি শ্রীনীলাচল হইতে গোপীবল্লভপুরে আসিলেন। রসিকানন্দের যশঃসৌরভ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এমন কি সুদূর দিল্লীর বাদসাহের কর্ণেও তাঁহার মহিমার কথা উঠিল। তখন সাহসুজা দিল্লীর বাদসাহ হইয়াছেন। তিনি কয়েকটী বন্য হস্তী ধরিয়া বশীভূত করিয়া দিবার জন্য রসিকের নিকট সসৈন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কারণ, তিনি শুনিয়াছিলেন, রসিক কৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া বন্য হস্তীকেও অনায়াসে বশীভূত করিতে পারেন। দূত কাঁথিতে শিবির স্থাপন করিয়া রসিকের নিকট বাদসাহের আদেশ-পত্র পাঠাইয়া দিলেন। রসিকানন্দ পত্র পাঠ করিয়া হাস্য করিলেন এবং পত্র বাহককে তাহার উত্তর দিয়া পাঠাইলেন যে,—"কুড়িটী হস্তী আপনাদের নিকট উপস্থিত হইবে। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন। নির্দ্দি দিনে হস্তীযূথ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। রসিকের এই আশ্চর্য্য মহিমা দর্শন করিয়া রাজ দূত ও রাজানুচরগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তাঁহারা রসিকের মহিমা গান করিতে করিতে দিল্লীতে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর রসিকানন্দ দেশে দেশে ভক্তি ধর্ম্ম প্রচার করিতে করিতে স্বদল বলে সুকপালে উপনীত হইলেন। তথায় এক বন-পথ দিয়া যাইবার কালে দুইটী ব্যাঘ্র তাঁহার সম্মুখীন হয়। রসিকের দর্শন মাত্রে তাহাদের দারুণ হিংস্র-স্বভাব কিজানি কি এক অলৌকিকী শক্তি

প্রভাবে সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহারা রসিকের পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রসিক তাহাদের কর্ণে "কৃষ্ণ মন্ত্র" প্রদান করিলেন। ব্যাঘ্রদ্বয় সেই পশু-দেহেও প্রেম-বিবশ হইয়া নিবিড় অরণ্যান মধ্যে চলিয়া গেল। রসিকের সঙ্গিগণ সেই অলৌকিক প্রভাব দর্শন করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। অনন্তর রসিকানন্দ সুকপাল গ্রামে উপনীত হইয়া তথাকার এক দুর্দ্দান্ত কোল-দস্যুকে উদ্ধার করিলেন। নিত্য শত শত লোকের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করাই সেই দস্যুর কার্য্য। রসিক, শ্যামানন্দদেবের কৃপা-শক্তির বলে তাদৃশ ভয়ঙ্কর স্বভাব পাষণ্ডকেও পরম সাধু করিলেন। দেশ-বাসী সকলেই দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনে ও শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা গানে বিভোর হইল। রসিক এইরূপে তথায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া নাগপুরে গমন করিলেন। পরে তথা হইতে শেখর দেশে উপনীত হইলেন। বহু দিন বৃষ্টি না হওয়ায় সে দেশ একবারে মরুভূমি প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, রসিকের পদার্পণে সে দেশে সুবৃষ্টিপাত হইল। দেশ বিবিধ শস্য পূর্ণ হওয়ায়, লোকের সুখ সৌভাগ্য উথলিয়া উঠিল। শেখররাজ রসিকের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অতঃপর তথা হইতে রসিক বিষ্ণুপুরে শ্রীমদনমোহন দর্শন করিয়া কেন্দুবিল্ব গ্রামে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট দর্শন করিলেন। পরে শ্রীপাট অম্বিকায় শ্রীশ্রীগৌর নিতাই দর্শন করিয়া ভাগীরথীর উভয় তটবর্ত্তী শ্রীগৌরাঙ্গের সমুদায় লীলাস্থান দর্শন করিলেন। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বহু তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিয়া রসিক স্বগণ সহ শ্রীপাট গোপী-বল্লভপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এইরূপে রসিকানন্দ কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে দেশে দেশে ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রভুর ধর্ম্ম প্রচার ও জীবোদ্ধার করিয়া ১৫৭৬ শকে নিত্যধামে প্রস্থান করিলেন। তিনি ৬২ বৎসর ৯ মাস কাল

ধরাধামে প্রকট বিহার করিয়াছিলেন। আঠার বৎসর বয়সে তিনি শ্যামানন্দদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পর উনিশ বৎসর সাত মাস শ্যামানন্দ প্রভুর সঙ্গে প্রেমভক্তি প্রচার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন এবং শ্যামানন্দের তিরোভাবের পর চব্বিশ বৎসর নয়মাস শ্রীগুরু দেবের আজ্ঞায় কৃষ্ণ-প্রেমনামামৃতে গৌড়োৎকলের সকল জীবকে পরিসিক্ত করেন।

রসিকের অপ্রকট কাহিনী অতীব অলৌকিক। রসিক স্বীয় অন্তিম-সময় সমাগত জানিয়া আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব ও শিষ্যগণকে বলিলেন—যেন তিরোধানের পর তাঁহার দেহ রেমুনায় ক্ষীর-চোরা শ্রীগোপীনাথের নিকট সমাহিত করা হয়। এই কথা শুনিয়া সকলে মহাচিন্তান্বিত হইলেন—বুঝিলেন "ঠাকুর গোসাঞি" আর বেশীদিন প্রকট থাকিবেন না। রসিক যখন বাঁশদা নামক গ্রামে কীর্ত্তন বিলাসে নিমগ্ন; সেই সময়ে একটী ক্ষুদ্র কণ্টক তাঁহার পদে বিদ্ধ হইল। সেই উপলক্ষে তাঁহার অঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইল। তিনি সকলকে স্বীয় অন্তিমকাল সমাগত জানাইলেন এবং শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে আর গমন করিলেন না। শিষ্যগণ তাঁহাকে দোলায় আরোহণ করাইয়া রেমুনায় লইয়া গেলেন। তথায় শ্রীগোপাল দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার শ্রীমন্দিরে যেমন প্রবেশ করিলেন, আর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। ভক্তগণ বলেন, তিনি শ্রীগোপালের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। আরও উক্ত আছে, এই সময়ে তিনি এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া গোলকে গমন করিয়াছিলেন, এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তখন সকলেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক পরে তাঁহার বসনভূষণ মাল্যাদিই শ্রীগোপালের নিকট সমাহিত করা হয়। অদ্যাপি সে সমাধিমন্দির বর্ত্তমান আছে।

রসিকানন্দের তিন পুত্র। শ্রীরাধানন্দ, শ্রীকৃষ্ণগতি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস এবং এক কন্যা নাম শ্রীবৃন্দাবতী। সমগ্র বৈষ্ণবমণ্ডলীর অভিপ্রায় অনুসারে রসিকানন্দ, অপ্রকটের বহুপূর্ব্বেই শ্রীরাধানন্দদেবকে শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবমণ্ডলের অধিকারী করিয়া গোপীবল্লভপুরের শ্রীপাটে প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাবধি তদ্বংশীয়গণ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে করিতেছেন। রসিক বংশাবতংস বৈষ্ণব সুধী শ্রীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামী মহাশয় রসিকানন্দ হইতে অধস্তন নবমপুরুষ বর্ত্তমান মহান্ত শ্যামানন্দীসম্প্রদায়ের নক্ষত্রমণি শ্রীল শ্রীযুক্ত নন্দনন্দানন্দদেব গোস্বামী মহোদয় এক্ষণে পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিয়া শ্রীপাটের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন।

প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে অধিবাস হইয়া দ্বাদশদিনব্যাপী মহোৎসব হইয়া থাকে। বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বৈষ্ণব ও নানা শ্রেণীর দর্শক ঐ শ্রীগোপীবল্লভপুরে আগমন করেন। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের ঝাড়গ্রাম বা গিধ্‌নি ষ্টেশনে নামিয়া কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে গমন করিলেই শ্রীগোপীবল্লভপুরে যাওয়া যায়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

ভক্তির স্নিগ্ধালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইলে মনুষ্য কিরূপ উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করেন তাহা ভক্তগণের মধুর জীবন-কাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করিলেই সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়। শ্যামানন্দ দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও, জাতিগৌরবে বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ না হইয়াও, কিরূপে

তিনি কাঙ্গালের পর্ণ কুটীর হইতে রাজাধিরাজের সুরম্য প্রসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই গুরুরূপে পূজিত হইয়াছিলেন, কিরূপে বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ হইতে সমাজের সর্ব্ব নিম্নস্তরস্থিত হুন, পুকষ, চণ্ডালাদি পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার চরণ-প্রান্তে মস্তক লুটাইয়াছিল, তাহা ভাবিতে গেলে হর্ষে বিস্ময়ে প্রাণ অভিভূত হইয়া পড়ে। শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি জন্মে, দেবতাগণের সমস্ত গুণ তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হয়। তাদৃশ মহা-পুরুষকে দর্শন করিলে কাহার চিত্ত না তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়? প্রেমভক্তির প্রত্যক্ষ-অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জগতের বক্ষে যে ব্রহ্মাদিদেব-দুর্লভ প্রেমভক্তির উদ্দাম তরঙ্গ উঠাইয়াছিলেন। সে তরঙ্গে ডুবিয়া বহুপাপী-তাপী সংসারের দাব-দাহ জুড়াইয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের পর তাঁহার শক্তি শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ পরবর্ত্তী প্রচারক রূপে ভারতে প্রেমভক্তির ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। শ্রীনিবাস প্রধানতঃ পশ্চিম বঙ্গ, নরোত্তম পূর্ব্ববঙ্গ এবং শ্যামানন্দ সমগ্র দক্ষিণদেশ কৃষ্ণপ্রেম ও কৃষ্ণনামামৃতের মহাপ্লাবনে ভাসাইয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর কায়স্থ আর শ্যামানন্দ প্রভু সদ্গোপ; কিন্তু ভক্তিধর্ম্ম বা সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের এমনই প্রভাব, এমনই বিশেষত্ব, তাঁহারা সেই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতারগুণে শত শত বর্ণাভিমানী ব্রাহ্মণেরও গুরুস্থানীয় হইয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন—

"কিবা বিপ্র কিবান্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের জীবনে এই শাস্ত্র বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ, রাজা বীরহাম্বীরাদি যেমন শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুরের প্রধান সহায় ছিলেন, সেইরূপ শ্যামানন্দ প্রভুর রসিকানন্দই প্রধান অবলম্বন। শ্যামানন্দ রসিককে

যোগ্যতম দর্শনে শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রচার কার্য্যে ব্রতী করিয়া আপনি শেষজীবনে অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা ভজনানন্দে থাকিবার শুভ-অবসর পাইয়াছিলেন। শ্রীগুরু কৃপায় রসিক বিশেষ প্রতিভাশালী হইয়া অনেক অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয়-ভেরী গম্ভীর শব্দে নিনাদিত হইয়াছিল। শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দ যে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন সেই স্থানই পরম প্রেমময় ও আনন্দময় হইয়া উঠিত এবং মূঢ়, পাষণ্ড ও ভক্তি-বর্জ্জিত শত শত নরনারী কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের চরণে শরণ গ্রহণ করিত। এইরূপে অসংখ্য ব্যক্তি তাঁহাদের শিষ্য হইয়াছিল। "রসিক-মঙ্গল" ও "প্রেম-বিলাস" নামক প্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থে শ্যামানন্দী প্রধান প্রধান শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেরই নামোল্লেখ আছে। সে সকল নাম উদ্ধৃত করিয়া অনর্থক গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। তন্মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ক্ষত্রিয়, রাজা, জমিদার প্রভৃতি তাঁহাদের নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তন্মধ্যে কয়েকজন ব্রাহ্মণশিষ্যের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা— রসিক মঙ্গলে,—

"মদনমোহন দাস দ্বিজগদাধর।
বলভদ্র দ্বিজ বন্দো বংশী দ্বিজবর॥
বন্দো দ্বিজ পুরুষোত্তম বড় ভাগ্যবান।
শ্যামানন্দ প্রভু যাঁর জাতি ধন প্রাণ॥
দ্বিজ দামোদর বন্দো শ্যামানন্দ দাস।
শ্যামানন্দ শ্রীচরণে যাঁর নিজবাস॥

দ্বিজ হরিদাস বনমালী দ্বিজোত্তম।
রাধা কৃষ্ণ পীতাম্বর বৈশ্য নারায়ণ ॥
গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য বঙ্গেতে নিবাস।
বঙ্গেতে করিল শ্যামানন্দের প্রকাশ ॥

* * *

আদ্য শিষ্য ব্রাহ্মণ কালিন্দী কৃষ্ণদাস।
রসিকের চরণে যাঁহার নিজ বাস ॥
দ্বিজ রামকৃষ্ণদাস অতি শুদ্ধ মতি।
রসিকেন্দ্র বিনা যাঁর আর নাহি গতি ॥

* * *

ব্রাহ্মণ পরমানন্দ অতি শুদ্ধ চিত।
রসিক কৃপায় হৈলা অতি সুপণ্ডিত ॥
দ্বিজ কুলে জনমিলা গৌর গোপাল।
রসিকেন্দ্র বিনা কিছু না জানয়ে আর ॥
দ্বিজ গোপীনাথ উদাসীন মহাশয়।
নিরবধি রসিকেন্দ্র যাঁহার হৃদয় ॥

* * *

তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য শ্যামসুন্দর।
প্রেমভক্তি যাঁরে দিলা রসিকশেখর ॥
রসিকের শিষ্য দ্বিজ সুন্দর রায়।
কৃষ্ণ প্রেমভক্তি মূর্ত্তিমন্ত মহাশয় ॥

* * *

দ্বিজমুরারীদাস দ্বিজ গোপাল।
রসিকের শিষ্য দ্বিজ দাস শ্রীদয়াল ॥

দ্বিজ গোপীমোহন দাস শ্যামমোহন।
দ্বিজ যদুনাথ রসিকের প্রিয়জন॥

* * *

দ্বিজ শ্রীনাগর শিরোমণিমহাশয়।
মুকুন্দ মোহন হরিনন্দন তনয়॥

* * *

গোকুল সুন্দর হরি মথুরা মোহন।
রাধা গোপাল শ্রীরাধাকিশোর ব্রাহ্মণ॥

* * *

দ্বিজ অনন্ত দ্বিজ পুরুষোত্তম দাস।
দ্বিজ কানু দ্বিজরাম দ্বিজশ্যামদাস॥
দ্বিজ বংশী দ্বিজ ভজ দ্বিজ রাধাদাস।
কহনে না যায় শ্যামানন্দী ভৃত্য দাস॥"

এই ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনাগর শিরোমণি, শ্রীশ্যামসুন্দর তর্কালঙ্কার প্রভৃতি নামেই তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গৌরবমণি বেদান্ত-সূত্রাদির প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও শ্যামানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। গুরু প্রণালী অনুসারে বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীরসিকানন্দদেবের চতুর্থ শিষ্য বলিয়া অবগত হওয়া যায়। শ্রীশ্যামানন্দদেব শ্রীবৃন্দাবনে যে শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দরের সেবা প্রকাশ করেন, শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ সেই শ্রীশ্যাম-সুন্দরের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। শিষ্য-পরম্পরা ব্যতীত প্রায় সেবাধিকার লাভ করিতে দেখা যায় না। সুতরাং বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে শ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কেহ

কেহ বলেন, তিনি প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মন্ত্রশিষ্য। তিনি যদি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার কোন না কোন গ্রন্থে অবশ্যই তাহার উল্লেখ থাকিত। তিনি বেদান্ত স্যমন্তক ও ভাগবতামৃত গ্রন্থের টিপ্পনীর উপসংহারে লিখিয়াছেন—

নিত্যং নিবসতু হৃদয়ে চৈতন্যাত্মা মুরারি র্নঃ।
নিরবদ্যা নিবৃতিমান্ গজপতিরনুকম্পয়া যস্য ॥"

এই শ্লোকোক্ত "মুরারি" শব্দ প্রধানতঃ শ্রীরসিক মুরারিকে উদ্দেশ করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার গজপতিও উৎকল দেশের এক জন প্রসিদ্ধ রাজা। অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিশ্চয়ই উৎকলদেশবাসী শ্যামানন্দ সম্প্রদায়ী ছিলেন। ইনিও ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত। ইঁহার অপর নাম "রাধা-দামোদর।"

আবার অনেক রাজা ও জমিদারও শ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য হইয়াছিলেন। যথা—

"বন্দিনু শ্রীকৃষ্ণ ভঞ্জ দেব মহারাজা।
দৃঢ় ভাবে শ্যামানন্দ পদে সেবা পূজা ॥" রঃ মঃ।

পটাসপুরের রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ, রাজা উদ্দণ্ড রায়, জমিদার ভীম শ্রীকর, কোল পুরাধিপতি প্রভৃতি।

শ্রীশ্যামানন্দ-কল্প বৃক্ষের যে অসংখ্য শাখা তাহা ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এই সকল শাখা প্রশাখায় অর্থাৎ শিষ্যানুশিষ্যে গৌড়োৎকল পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ শ্যামানন্দীর ন্যায় বিরাট বৈষ্ণব গোষ্ঠী প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তন্মধ্যে প্রধান দ্বাদশ শাখার বর্ণনা বিষয়ক যে একটী পদ ভক্ত-সমাজে প্রচলিত আছে, পাঠক গণের অবগতির জন্য তাহা এস্থলে লিখিত হইল।—

কিশোর উদ্ধব আর, পুরুষোত্তম দামোদর,
কাশীয়াড়ীতে এই চারি ঘর।
রসিক মুরারি আর, রোহিনীতে বাস যাঁর
ধারেন্দাতে দোহেঁ দামোদর"
চিন্তামণি নাম যাঁর, বড় গ্রামে বাস তাঁর,
বলভদ্র রহে রাজগ্রাম।
হরিহর পুরে ঘর, নাম শ্রীজগদীশ্বর,
শাঁকোয়াতে শ্রীমধুসূদন।
শ্রীগোপীবল্লভপুর, গোপীনাথের মন্দির,
শ্রীআনন্দানন্দ ভোগরাই।
দ্বাদশ শাখার বাস, বন্দনা করিয়া আশ
আনন্দেতে পাঁচালীতে গাই॥"

আবার "প্রেম-বিলাসে" শ্যামানন্দী প্রধান প্রধান শাখার যে বর্ণনা আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

অনন্তর ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বা ঘনশ্যাম দাস শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীরসিকানন্দের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে ৪টী পদ রচনা করিয়াছেন, ভক্ত পাঠকগণের আনন্দ-বিধানের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপসংহার করা হইল।

যথা—বেলাবলী।১।

জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ।
অবিরত গৌর,— প্রেমরসে নিমগণ,
ঝলকত তনু নব পুলক আনন্দ॥ধ্রু॥
শ্যামর গৌর, চরিতচয় বিলপত,
বদন সুমাধুরী হরয়ে পরাণ।

নিরুপম পঁহু, পরিকর শুনইতে,
ঝরঝরই সুকমল নয়ান ॥
উমড়ই হিয়, অনিবার চুয়ত ঘন,
স্বেদবিন্দু সহ তিলক উজোর।
অপরূপ নৃত্য, মধুরতর কীর্ত্তনে
তুলসীমাল উর চঞ্চল থোর ॥
সুমধুর গীম, ধুনত অনুমোদনে,
ভুজ ভঙ্গিম কর তরল ললাম।
পদতলে তাল, ধরত কত ভাঁতিক,
মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম ॥

যথা—কামোদ।২।

ও মোর পরাণ বন্ধু, শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু,
সদাই বিহ্বল গোরা-গুণে।
গৃহ পরিহরি দূরে, আনন্দে অম্বিকাপুরে,
আইলেন প্রভুর ভবনে ॥
হৃদয়চৈতন্য দেখি, অঝরে ঝরয়ে আঁখি,
ভূমেতে পড়য়ে লোটাইয়া।
শিরে ধরি সে চরণ, করি আত্মসমর্পণ,
এক ভিতে রহে দাঁড়াইয়া ॥
দেখি শ্যামানন্দ রীত, ঠাকুর করিয়া প্রীত,
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈলা।
করি অনুগ্রহ অতি, শিখাইয়া ভক্তি রীতি,
নিতাই চৈতন্যে সমর্পিলা ॥

কথোক দিবস পরে, পাঠাইতে ব্রজপুরে,
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা।
প্রভু নিতাই চৈতন্য, শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য,
যাত্রা কালে আজ্ঞা মালা দিলা॥
শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে আঁখির জলে,
সঙরিয়া প্রভুর গুণগণ।
একাকী কথোক দিনে, প্রবেশিলা ব্রজভুমে,
বহুতীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥
দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য, আপনা মানয়ে ধন্য,
আনন্দে ধরিতে নারে থেহ।
সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে, লোটায় ধরণী তলে,
বিপুল পুলকময় দেহা॥
গিয়া গিরি গোবর্দ্ধনে, কৈ'ল যা আছিলা মনে,
শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা দেখি অনুগ্রহ কৈলা,
শ্রীদাস গোঁসাই গুণ রাশি॥
শ্রীজীব নিকটে গেলা, নিজ পরিচয় দিলা,
তেঁহো কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।
যেবা মনোরথ ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হৈল,
হৃদয়চৈতন্য কৃপা হৈতে॥
ভ্রমিলা দ্বাদশ বন, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন,
হৈলা অতি নিপুণ সেবায়।
শ্রীগৌড় অম্বিকা হৈয়া, রহিলা উৎকলে গিয়া,
শ্রীগোস্বামীগণের আজ্ঞায়॥

পাষণ্ডী অসুরগণে, মাতাইলা গোরা-গুণে,
কারে বা না কৈলা ভক্তি দান।
অধম আনন্দে ভাসে, শ্যামানন্দ কৃপা লেশে,
কেবা না পাইল পরিত্রাণ॥
কে জানিবে তাঁর তত্ত্ব, সদা সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত,
অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ পরিকর সঙ্গে, বিলসে পরম রঙ্গে,
উৎকলে সুখের নাই সীমা।
যে বারেক দেখে তাঁরে, সে ধৃতি ধরিতে নারে,
কিবা সে মূরতি মনোহর।
নরহরি কহে কভু, রসিকানন্দের প্রভু,
হবে কি এ নয়ন-গোচর॥

পুনঃ সুহই।৩

জয় শ্রীদুঃখী— কৃষ্ণদাস গুণ,
কহিতে শকতি কার।
হৃদয় চৈতন্য— পদাম্বুজে সদা,
চিত-মধুকর যার॥
বৃন্দাবনে নব— নিকুঞ্জ রাইর
নূপুর পাইল যে।
শ্যামানন্দ নাম, বিদিত তথায়
সুচরিত বুঝিব কে॥
মহা মূঢ়মতি, উৎকলেতে যার,
নাস্তিক ভকতি লেশ।

গৌর-প্রেমরসে, ভাসাইল সব,
সফল করিল দেশ ॥
পর দুঃখে দুঃখী, শ্যামানন্দ মোর,
রসিকানন্দের প্রভু।
কি কব করুণা, যেহোঁ নরহরি,
দীনে না ছাড়য়ে কভু ॥

যথা—বেলাবলী।৪।

জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারি।
করুণাময় কলি— কলুষ বিভঞ্জন,
নিরমল গুণগণ জনমনোহারী ॥
প্রবল প্রতাপ, পূজ্য পরমাদ্ভুত
ভক্তি-প্রকাশক সুখদ সুধীর।
ডগমগ প্রেম, হেম সম উজ্জ্বল,
ঝলকত অতিশয় ললিত শরীর ॥
শ্যামানন্দ চরণ চিত-চিন্তন
অনুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন রস পান।
যা কর সব রস, গৌরচন্দ্র বিনু
কি কহব স্বপনে না জানয়ে আন ॥
অপরূপ কীর্ত্তি, লসত ত্রিজগত মধি,
কবিবর কাব্য-বিদিত অনুপাম।
নিপট উদার, চরিত চারু কছু
সমুঝি না শকত পতিত ঘনশ্যাম।

সম্পূর্ণ।